POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○

এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল), 'আমি নিকেট আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাহতে তাহারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। (আল বাকারা: ১৮৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

খণ্ড 11

সংখ্যা 13-14

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 26 Mar-2 Apr 2026 6-13 শওয়াল 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

লায়তাতুল কদর এর ফজিলত

আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমজানের রোজা ফরজ করেছেন। এই মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। এতে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়, সে প্রকৃতপক্ষে বঞ্চিত হয়।

(মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২৫)

সাগীরা গুনাসমূহের প্রায়শ্চিত্ত

হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন: পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমা থেকে আরেক জুমা এবং এক রমজান থেকে আরেক রমজান-এসব তাদের মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের জন্য কাফফারা হয়, যদি কেউ বড় গুনাহ থেকে বিরত থাকে।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত)

সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সবার পক্ষে তো রোজাদারকে ইফতার করানো সম্ভব নয়।'

তখন তিনি বললেন, 'এই সওয়াব সেই ব্যক্তিও পাবে, যে কোনো রোজাদারকে এক চুমুক দুধ, অথবা এক চুমুক পানি, কিংবা একটি খেজুর দিয়ে ইফতার করায়। আর যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে পেট ভরে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে আমার হাউয (কাউসার) থেকে এমনভাবে পান করাবেন যে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে আর পিপাসার্ত হবে না।'

সুফিগণ লিখেছেন যে এই মাস অন্তরের আলোকপ্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সময়। এ মাসে প্রচুর পরিমাণে আধ্যাত্মিক উন্মোচন (মুকাশাফাত) ঘটে। নামাজ আত্মাকে (নফস) পবিত্র করে এবং রোজা (সাওম) অন্তরের জ্যোতি বৃদ্ধি করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

"রমযান মাস-যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে"(আল-বাকারা: ১৮৬)। এই আয়াত থেকে রমযান মাসের মহিমা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুফিগণ লিখেছেন যে এই মাস অন্তরের আলোকপ্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সময়। এ মাসে প্রচুর পরিমাণে আধ্যাত্মিক উন্মোচন (মুকাশাফাত) ঘটে। নামাজ আত্মাকে (নফস) পবিত্র করে এবং রোজা (সাওম) অন্তরের জ্যোতি বৃদ্ধি করে।

আত্মার পবিত্রতা বলতে বোঝায় যে মানুষ নফসে আম্মারার কামনা-বাসনা থেকে দূরে সরে যায়, আর অন্তরের জ্যোতি বলতে বোঝায় যে তার ওপর এমনভাবে আধ্যাত্মিক উন্মোচনের দ্বার খুলে যায় যে সে আল্লাহকে উপলব্ধি করতে পারে। অতএব "উনজেলা ফিহিল কুরআন"(আল-বাকারা: ১৮৬) এই কথার মধ্যেও এই দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে রোজার প্রতিদান মহান, কিন্তু রোগব্যাধি ও বিভিন্ন স্বার্থ মানুষকে এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে। আমার স্মরণে আছে, যৌবনকালে একবার আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে রোজা রাখা আহলে বাইতের সুন্নত। আমার সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন: "সালমান আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত-এখানে সালমান অর্থ আস-সুলহান (মীমাংসাকারী), অর্থাৎ এই ব্যক্তির মাধ্যমে দুই ধরনের সমঝোতা ঘটবে-একটি অভ্যন্তরীণ এবং একটি বাহ্যিক-এবং সে তার কাজ কোমলতা ও নম্রতার মাধ্যমে সম্পন্ন করবে, তলোয়ার দ্বারা নয়।

যেহেতু আমি হুসাইনের পথের অনুসারী নই-যিনি যুদ্ধ করেছিলেন-বরং হাসানের পথের অনুসারী, যিনি যুদ্ধ করেননি, তাই আমি বুঝলাম এটি রোজার প্রতি ইঙ্গিত। সেই অনুযায়ী আমি ছয় মাস পর্যন্ত রোজা রেখেছিলাম। এ সময় আমি দেখেছিলাম যে নূরের স্তম্ভের পর স্তম্ভ আকাশের দিকে উঠছে। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে সেই নূরের স্তম্ভগুলো পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে উঠছিল, নাকি আমার নিজের হৃদয় থেকে-কিন্তু এই সব কিছুই যৌবনকালে সম্ভব ছিল। সে সময় যদি আমি চাইতাম, তবে চার বছর পর্যন্ত রোজা রাখতে পারতাম।

আনন্দ ও যৌবন ত্রিশ বছর পর্যন্ত থাকে;

চল্লিশ এলে ডানা ও শক্তি ঝরে পড়তে শুরু করে।

এখন যেহেতু আমার চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, আমি দেখি যে আর আগের মতো নেই। আগে আমি বহুবার হেঁটে বাটালা পর্যন্ত যেতাম এবং ফিরে আসতাম, কোনো ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করতাম না। কিন্তু এখন যদি পাঁচ-ছয় মাইলও যাই, তবে কষ্ট অনুভূত হয়। চল্লিশ বছরের পর শরীরের স্বাভাবিক তাপ কমতে শুরু করে, রক্ত কম উৎপন্ন হয়, এবং মানুষ নানা দুঃখ-কষ্ট ও আঘাতের সম্মুখীন হয়। এখন বহুবার দেখা গেছে যে ক্ষুধার চিকিৎসায় দেরি হলে শরীর অস্থির হয়ে পড়ে।

(মালফুযাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৬১, কাদিয়ান সংস্করণ, ২০০৩)

প্রত্যেক মানুষের সম্পদের মধ্যে তার আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং পথিকদের একটি অধিকার রয়েছে। যখন তোমরা কোনো জনপদে যাবে, তখন তিন দিন পর্যন্ত তোমাদের আতিথেয়তার অধিকার রয়েছে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা বনি ইসরাঈলের ২৭ নম্বর আয়াতের তাফসীরে বলেন:

"আর আত্মীয়স্বজনকে তার প্রাপ্য দাও, এবং অভাবগ্রস্তকে ও পথিককে, আর অপব্যয় করো না।"

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক মানুষের সম্পদের মধ্যে তার আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং পথিকদের একটি অধিকার রয়েছে। আত্মীয়স্বজন নানা উপায়ে মানুষের উপার্জনে সহায়তা করে থাকে। তাই তার সম্পদের মধ্যে তাদেরও অধিকার থাকে। যেমন, যদি পিতা-মাতা এক ছেলেকে শিক্ষা দিয়ে উচ্চ পদে পৌঁছে দেন, আর অন্য ভাইরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে, তবে ঐ পদস্থ ব্যক্তির সম্পদে অন্য ভাইদেরও অধিকার রয়েছে। কারণ যে অর্থ দিয়ে তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, তাতে সবারই অংশ ছিল।

আল্লাহ তাআলা অভাবগ্রস্ত ও পথিকের অধিকারও নির্ধারণ করেছেন এবং অন্যত্র তা আরও স্পষ্ট করে বলেছেন:

"এবং তাদের সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের জন্য একটি অংশ ছিল।" (সূরা আয-যারিয়াত)

অর্থাৎ মানুষের সম্পদের মধ্যে প্রার্থনাকারী এবং অন্যান্য অভাবগ্রস্তদেরও অধিকার রয়েছে। অভাবগ্রস্তদের অধিকার নির্ধারণের একটি কারণ হলো-দুনিয়াতে ধনী-গরিবের অবস্থা পরিবর্তনশীল। যারা আজ গরিব, তারা একসময় ধনী ছিল, আর যারা আজ ধনী, তারা একসময় গরিব ছিল। আর সেই সময়ের ধনীরা তাদের সাথে সদাচরণ করেছিল। সুতরাং, সমগ্র পৃথিবীকে সামগ্রিকভাবে দেখলে বোঝা যায় যে কারো সম্পদই একান্তভাবে তার নিজের নয়; বরং এতে অন্যদের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আরেকটি কারণ হলো-পৃথিবীর সব বস্তু আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতির জন্য সৃষ্টি করেছেন, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি যেমন যায়েদ বা বকর-এর জন্য নয়। তাই যদি যায়েদ বা বকর কোনো কারণে অধিক সম্পদশালী হয়ে যায়, তবে তাতে অন্যদের অধিকার বাতিল হয়ে যায় না। তারা সবাই এই দুনিয়ার সম্পদের যৌথ অংশীদার। অবশ্যই বিশেষ পরিশ্রমের কারণে ইসলাম যায়েদ বা বকর-এর অতিরিক্ত অধিকার স্বীকার করে, কিন্তু তাদের একক ও পূর্ণ মালিক হিসেবে স্বীকার করে না।

পথিকদের অধিকার এইভাবে যে, যখন কেউ অন্য জায়গায় ভ্রমণ করে, তখন লোকেরা তার সাথে সদাচরণ করে। তাই অন্য জায়গা থেকে আগত পথিকের সেবা করা তার কর্তব্য, যাতে আতিথেয়তার অধিকার বজায় থাকে। পথিকের অধিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন তোমরা কোনো জনপদে যাবে, তখন তিন দিন পর্যন্ত তোমাদের আতিথেয়তার অধিকার রয়েছে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, যদি তারা তা না দেয়?" তিনি বললেন, "তবে তোমরা জোর করে তা নিতে পারো।" (আবু দাউদ)

এই নির্দেশ সেই সময়ের জন্য, যখন ইসলামী সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে। কারণ তখন অন্যরাও তাদের এই অধিকার আদায় করতে পারবে। যদি এই বিধান বিশ্বে চালু করা হয়, তবে হোটেল ও সরাইখানার কারণে যে অনেক

শেষাংশ পরের পাতায়..

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সন্তানদের তরবীয়তের সঙ্গে রমযানের সম্পৃক্ততা তাকওয়ার বাস্তব ভিত্তি

মানবজীবন তার প্রকৃত স্বরূপের দিক থেকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সাময়িক। পবিত্র কুরআন এই বাস্তবতাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে: "প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে"(আল ইমরান: ১৮৬)। এই আয়াত আমাদেরকে এই সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে দুনিয়ার জীবন পানির বুদবুদের মতো। কোনো মানুষই এই পৃথিবীতে চিরকাল থাকার জন্য আসেনি। একদিন না একদিন প্রত্যেক মানুষকে তার প্রকৃত স্রষ্টার সামনে উপস্থিত হতেই হবে। এই মৌলিক ধারণার ওপর ভিত্তি করেই একজন মুসলমান তার জীবনের প্রতিটি কাজকে অর্থবহ করার চেষ্টা করে, আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যাপারেও চিন্তিত থাকে।

আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা স্থাপন করেছেন যে সে তার সন্তানদের দীনী ও দুনিয়াবী উভয় দিক থেকেই সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। এই কারণেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামর্থ্য ও জ্ঞানের আলোকে তার সন্তানদের তরবীয়ত (লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ) করে। একজন আলেম তার সন্তানদের জ্ঞান শিক্ষা দেন, একজন ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসার নীতিমালা বুঝিয়ে দেন, আর একজন ডাক্তার বা হাকিম তার দক্ষতা বা চিকিৎসা পদ্ধতি তাদের মধ্যে স্থানান্তর করার চেষ্টা করেন। এই সমস্ত প্রচেষ্টার একটি উদ্দেশ্য হলো-তার সন্তানরা যেন শুধু তার প্রতিষ্ঠিত কাজগুলো বজায়ই না রাখে, বরং তা আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করে।

কিন্তু একজন মুসলমানের জন্য এর থেকেও বড় একটি দায়িত্ব রয়েছে-আর তা হলো তার সন্তানদের দীনী শিক্ষা দেওয়া, তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে তাকওয়ার চেতনা জাগ্রত করা। এটাই সেই প্রকৃত সম্পদ, যা মানুষের মৃত্যুর পরও তার জন্য উপকারী হতে থাকে এবং সদকায়ে জারিয়া ও চিরস্থায়ী সফলতার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, যখন কোনো মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে কয়েকটি বিষয় ব্যতীত-এর মধ্যে একটি হলো তার সন্তানের মধ্যে অব্যাহত থাকা নেক কাজ। এটি স্পষ্ট করে যে সন্তানের সঠিক তরবিয়ত শুধু দুনিয়াতেই উপকার বয়ে আনে না, বরং আখিরাতেও মানুষের জন্য রহমতের কারণ হয়।

রমযান মাস এই তরবীয়তের-এর জন্য একটি অত্যন্ত উপযোগী ও বরকতময় সময়। এটি এমন এক সময় যখন একজন মুসলমান ইবাদত, রোজা, নামাজ এবং কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকে এবং স্বাভাবিকভাবেই চায় যে তার সন্তানরাও এই নেক কাজে অংশগ্রহণ করুক। এমন পরিবেশে শিশুদের হৃদয়েও ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তারা তাদের পিতা-মাতার অনুসরণ করে রোজা রাখা ও নামাজ পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে-শিশুদের কোন বয়স থেকে রোজার অভ্যাস করানো উচিত? অল্প বয়সী শিশুদের কি জোর করে রোজা রাখতে বাধ্য করা উচিত, নাকি ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করানো উচিত? দেখা যায়, কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করে খুব ছোট শিশুদেরও জোর করে রোজা রাখায়, আবার কেউ অবহেলা করে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদেরও রোজা রাখতে উৎসাহিত করে না। পবিত্র কুরআন আমাদের একটি সাধারণ নীতি শিক্ষা দেয় যে উপদেশ ও তরবীয়তের-এর প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা উচিত: "আর তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কারণ উপদেশ অবশ্যই মুমিনদের উপকার করে" (আয-যারিয়াত: ৫৬)।

এই নীতির আলোকে হযরত মসীহ মওউদ (রাযি.) শিশুদের রোজা সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন:

"কেউ কেউ ছোট ছোট শিশুদেরও রোজা রাখায়। অথচ প্রত্যেক ফরজ ও বিধানের জন্য আলাদা আলাদা সীমা ও সময় রয়েছে। আমার মতে কিছু বিধানের সময় চার বছর বয়স থেকে শুরু হয়, কিছু সাত থেকে বারো বছর পর্যন্ত, এবং কিছু পনেরো বা আঠারো বছর বয়স থেকে শুরু হয়। আমার মতে রোজার হুকুম পনেরো থেকে আঠারো বছর বয়সী সন্তানের ওপর প্রযোজ্য, এবং এটাই সাবালকত্ব অর্জনের-এর সীমা। আমার মতে এর আগে শিশুদের দিয়ে রোজা রাখানো তাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, কারণ এই সময় তারা শক্তি ও সক্ষমতা অর্জন করছে। সুতরাং যখন তারা শক্তি সঞ্চয় করছে, তখন তাদের শক্তিকে দমন করা এবং বাড়তে না দেওয়া তাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। দেখ, তেলের ইঞ্জিন বা অন্য ইঞ্জিনে অতিরিক্ত বাষ্প বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু কখনোই এমন করা হয় না যে যখন বাষ্প তৈরি হচ্ছে এবং এখনও যথেষ্ট পরিমাণে পৌঁছায়নি, তখনই তা বের করে দেওয়া হবে। নদীতে যখন পানি বেশি থাকে, তখনই বাঁধ দিয়ে অন্যদিকে খাল কেটে পানি প্রবাহিত করা হয়। কিন্তু যদি পানি যথেষ্ট না থাকে, তাহলে তা নেওয়া হয় না। সুতরাং যখন শিশু শক্তি অর্জন করছে, তখন তার রোজা রাখা উচিত নয়-যতক্ষণ না তার বয়স পনেরো বছর হয়। কারণ এর আগে তার ওপর রোজা ফরজ নয়। শুধু তাই নয়, বরং চেষ্টা করা উচিত যেন তারা রোজা না রাখে, কারণ শিশুরা নিজেরাই রোজা রাখার আগ্রহ দেখায়।"

হযরত মসীহ মওউদ (রাযি.) আরও বলেন: "আমার মতে বারো বছরের কম বয়সী শিশুকে রোজা রাখানো একটি অপরাধ, এবং বারো থেকে পনেরো বছরের শিশুকে রোজা রাখালে তা ভুল। পনেরো বছর বয়স থেকে রোজার অভ্যাস করানো উচিত এবং আঠারো বছর বয়সে রোজাকে ফরজ হিসেবে গণ্য করা উচিতৃ এভাবে ধীরে ধীরে তাদের রোজায় অভ্যস্ত করা উচিত।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯, জুমার খুতবা, ৩ এপ্রিল ১৯২৫)

হযরত মসীহ মওউদ (রাযি.)-এর এই বক্তব্য ইসলামের একটি সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরে-ইবাদতের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য, প্রজ্ঞা এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার নীতি অনুসরণ করতে হবে। ইসলাম অপ্রয়োজনীয় কঠোরতার শিক্ষা দেয় না, আবার অবহেলাকেও অনুমোদন করে না; বরং প্রত্যেক কাজকে তার উপযুক্ত সময় ও অবস্থার ভিত্তিতে সম্পাদনের নির্দেশ দেয়।

একইভাবে, পবিত্র কুরআন অসুস্থতার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ছাড় প্রদান করে, তবে মানুষের স্বভাবগত দুর্বলতা ও অজুহাত প্রদানের প্রবণতার দিকেও ইঙ্গিত করে: "নিশ্চয়ই মানুষ অস্থির ও দুর্বলভাবে সৃষ্টি হয়েছে"(আল-মা'আরিজ: ২০)।

এই বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন)। তিনি বলেন:

"পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো-যদি কেউ অসুস্থ হয়, তবে সে রোজা রাখবে না। কিন্তু এই আশঙ্কায় যে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, রোজা ছেড়ে দেওয়া ভুলৃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেনৃ অনেক মানুষ অজুহাত খোঁজৃে আল্লাহ মানুষের নিয়ত ও ইচ্ছা জানেনৃ যে সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান, আল্লাহ তার সঙ্গে সেই অনুযায়ী আচরণ করেন; আর যে অজুহাত খোঁজে, তার সঙ্গে তদনুযায়ী আচরণ করা হয়।" (জুমার খুতবা, ২৪ এপ্রিল ২০২০)

এই শিক্ষা আমাদের একটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। একদিকে ইসলাম অসুস্থতা ও দুর্বলতার ক্ষেত্রে ছাড় দেয়, অন্যদিকে আমাদেরকে এও শিক্ষা দেয় যে আমরা যেন আমাদের দুর্বলতাকে অজুহাত না বানাই, বরং আন্তরিকতার সাথে ইবাদত করি।

অতএব, রমযান কেবল রোজা রাখার নাম নয়; বরং এটি একটি সমন্বিত তরবীয়ত-এর ব্যবস্থা, যেখানে মানুষ নিজেকে সংশোধন করে, তার ইবাদতকে উন্নত করে এবং তার সন্তানদেরও নেকির পথে পরিচালিত করে। পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো জ্ঞান, ভালোবাসা ও ধীরে ধীরে অগ্রগতির মাধ্যমে সন্তানদের মধ্যে দীনী ভালোবাসা সৃষ্টি করা-কঠোরতা বা জোরজবরদস্তির মাধ্যমে নয়।

সংক্ষেপে, যদিও মানুষ এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী নয় এবং তাকে অল্প সময় পরই ফিরে যেতে হবে, তবুও সে এই সংক্ষিপ্ত জীবনকে চিরস্থায়ী করতে পারে-যদি সে তার সন্তানদের এমনভাবে তরবীয়ত করে, যা তাকওয়া, ইবাদত এবং আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

রমযান আমাদেরকে এই সোনালী সুযোগ প্রদান করে-যাতে আমরা শুধু নিজের সংশোধনই না করি, বরং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও নেকির পথে পরিচালিত করতে পারি।

১ম পাতার শেষাংশ....

সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর হয়ে যাবে এবং গরিবদের জন্যও ভ্রমণ-যা উচ্চতর শিক্ষার একটি মাধ্যম-সহজ হয়ে উঠবে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে মুসলমানরাই এই শিক্ষাকে ভুলে গেছে।

পথিকদের প্রতি সদাচরণের এই সাধারণ নির্দেশ পৃথিবী থেকে বহু ফিতনা দূর করতে পারে, কারণ বিবাদ ও সংঘাত সৃষ্টি হয় বিদ্বেষ থেকে। যদি এভাবে আতিথেয়তার প্রচলন হয়, তবে বিদ্বেষ দূর হবে এবংগ্রাম ও দেশের মধ্যে বিরোধ মিটে যাবে। যারা অন্য দেশের আতিথেয়তা থেকে উপকৃত হয়েছে, তারা সহজে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আগ্রহী হবে না, কিছু খারাপ স্বভাবের মানুষ ছাড়া। তাছাড়া এই নির্দেশ গ্রাম ও শহরের সংগঠন গঠনের ভিত্তিও স্থাপন করে, কারণ আতিথেয়তা পুরো সমাজের উপর দায়িত্ব হিসেবে আরোপ করা হয়েছে। ফলে এই দায়িত্ব পালনের জন্য একটি এমন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, যার মাধ্যমে পুরো সমাজ মিলে অতিথিদের সেবা করতে পারবে এবং এই ব্যবস্থা তাদের অন্যান্য কাজেও উপকারী হবে।

এরপর বলা হয়েছে: "অপব্যয় করো না।"

এর অর্থ হলো-উপরের যে ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে যেন কেউ না মনে করে যে সম্পদ অপচয় করে ফেলতে হবে। শুধু প্রয়োজনীয় ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; অপ্রয়োজনীয় অপচয় করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Berhampur, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

জুমআর খুতবা

আমাদের ক্লান্ত হওয়ার সঙ্গে কী সম্পর্ক? আমরা তো আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করতাম। কখনো কি ভিক্ষুক (প্রার্থী) ক্লান্ত হয়? যে চাইতে চাইতে ক্লান্ত হয়ে যায়, সে-ই বঞ্চিত হয়ে যায়। আমরা তো প্রার্থী, আর তিনি দাতা-তাহলে ক্লান্তি কিসের? যেখানেই সামান্য আশাও থাকে, সেখানে ভিক্ষুক দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। আর আল্লাহর দরবারে তো সব আশাই রয়েছে। তিনি দাতা, তিনি অশেষ দানকারী (ওহ্হাব), তিনি পরম দয়ালু (রহমান), পরম করুণাময় (রহীম) এবং তিনি মালিক, পরাক্রমশালী।"

(হযরত মসীহ মাওউদ আঃ)

রাসূলুল্লাহ ?-এর সুন্নাহর ওপর সবচেয়ে বেশি আমল করার দৃশ্য আমরা এ যুগে তাঁর সত্যনিষ্ঠ দাস, হযরত মসীহ মেহদী মাওউদ আঃ-এর জীবনে দেখতে পাই।

তাঁর অভ্যাস ছিল-রাতে এশার নামাজের পর তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তেন এবং রাত প্রায় একটা নাগাদ তাহাজ্জুদের জন্য জেগে উঠতেন। তাহাজ্জুদ আদায় করার পর কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করতেন।

এরপর যখন ফজরের আযান হতো, তখন তিনি ঘরে সুন্নত নামাজ পড়ে মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করতেন।

তিনি কুরআনুল কারীম এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর প্রতি গভীর প্রেম পোষণ করতেন। তাঁর সব ইবাদতই কুরআন ও সুন্নাহর সীমার মধ্যেই থাকত, কখনো তা অতিক্রম করত না।

নামাজের পাশাপাশি তাঁর নিয়মিত আমল ছিল-কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ পাঠ এবং ইস্তিগফার। কুরআনের প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। তিনি দিন-রাত, উঠতে-বসতে, এমনকি হাঁটতে হাঁটতেও কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতেন।

যখন ভূমিকম্প শুরু হয়, তখন তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনসহ আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দোয়ায় লেগে যান এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। দীর্ঘ সময় ধরে পুরো পরিবার ও খাদেমগণ কিয়াম, রুকু ও সেজদায় নিমগ্ন থেকে আল্লাহ্?র সামনে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দোয়া করতে থাকেন। (বর্ণনা: হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদিক রাঃ)

জামাতে নামাজ আদায়ের একটি পদ্ধতি হলো-স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে ঘরেই জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়া।

(হযরত মসীহে মাওউদের খলীফা, হযরত মসলেহ মাওউদ রাঃ)

আজও যেখানে ঘাটতি আছে, সেখানে মানুষের উচিত সচেতন হওয়া। ঘরে সন্তানদের সঙ্গে নামাজ আদায় করলে তাদের মধ্যেও নামাজের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

শৈশবকাল থেকেই তাঁর দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ছিল এবং খুব ছোটবেলাতেই তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ্?র সন্তুষ্টি অর্জনের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। (হযরত মসলেহ মাওউদ রাঃ)

যখন লোকসমাগম কম ছিল, তখন তিনি প্রায়ই এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতেন যে-"হায়! যদি আমার নিজস্ব একটি জামাত থাকত, যাদের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারতাম।" তিনি বলতেন-"আমি দোয়ায় ব্যস্ত আছি এবং আশা করি আল্লাহ্ তাআলা আমার দোয়া কবুল করবেন।"

আজ আল্লাহ্র অনুগ্রহে নামাজিদের সংখ্যা আশি-নব্বইয়ে পৌঁছেছে। (বর্ণনা: হযরত মাওলভী আবদুল করীম রাঃ)

এখন আল্লাহ্র কৃপায় প্রতিটি দেশে আমাদের মসজিদ রয়েছে। তাই আমাদের উচিত-পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য মসজিদগুলোকে আবাদ রাখা এবং যথাসম্ভব প্রতিটি নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা।

তিনি যেভাবে নামাজ আদায় করতেন, তা আমার জানা আছে। প্রতিটি নামাজ তিনি অত্যন্ত আবেগ ও বিনয়ের সঙ্গে আদায় করতেন। এমনভাবে, যেন কোনো শিশু তার মা-বাবার সামনে কেঁদে কিছু চাইছে। তাঁর এই নামাজ আমাদের মতো অনুসারীদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলত। (বর্ণনা: হযরত আবদুস সাত্তার রাঃ)

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (১৩ তবলীগ, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমরা এ যুগে তাঁর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাঝে দেখতে পাই। মহানবী (সা.)-এর ইবাদত এবং এ সম্পর্কে তাঁর নিজের অনুসারীদের ইবাদতের রীতি-পদ্ধতি এবং যিকরে ইলাহীর নিয়মাবলি শেখানোর বিভিন্ন ঘটনা সাম্প্রতিক খুতবাগুলোতে বর্ণনা করাহয়েছে।

আজ আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেসব ঘটনা বর্ণনা করব যা তিনি তাঁর মনিব মহানবী (সা.)-এর অনুসরণে সম্পাদন করেছেন এবং যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, গুরুদাসপুর জেলার লঙ্গরওয়াল নিবাসী মির্যা মুহাম্মদ দীন সাহেব তাঁকে লিখে পাঠিয়েছেন, শৈশবকাল থেকেই আমার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখার সুযোগ হয়েছে। আর সর্ব প্রথম আমি তাঁকে হযরত মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেবের জীবদ্দশায় দেখেছিলেন, যখন আমি একেবারেই ছোটো ছিলাম।

তাঁর [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর] অভ্যাস ছিল, রাতে এশার পর দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তেন এবং এরপর রাত প্রায় একটার দিকে তাহাজ্জুদের জন্য উঠে যেতেন। তাহাজ্জুদ পড়ে তিনি নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এরপর যখন ফজরের আযান হতো, তখন সুন্নত (নামায) বাড়িতে পড়ে নামাযের জন্য মসজিদে যেতেন এবং বাজামা'ত নামায পড়তেন। কখনও তিনি নিজেই নামায পড়াতেন, আবার কখনও মসজিদের ইমাম মিয়াঁ জান মুহাম্মদ সাহেব নামায পড়াতেন। নামায থেকে ফিরে এসে তিনি কিছুক্ষণ ঘুমাতেন। আমি তাঁকে মসজিদে সুন্নত নামায পড়তে দেখি নি। তিনি সুন্নত নামায বাড়িতেই পড়তেন।" (সীরাতুল মাহদী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫১৩-৫১৪)

হযরত মসীহ্ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে ইবাদত করার শক্তি দিয়েছেন সে সম্পর্কে বলেন, এটি প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য নয় যে, সে নিজের শক্তিসামর্থ্যের উর্ধ্বে গিয়ে এমনটি করবে। কারণ তিনি (আ.) বলেছেন, "আমাকে তো আল্লাহ্ তা'লা এক বিশেষ শক্তি দিয়েছেন।" যাইহোক, তিনি নিজের অবস্থার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা নিম্নরূপ। তিনি (আ.) বর্ণ না করেন, "আমি কখনও কঠোর সাধনা করি নি এবং বর্তমান যুগের কোনো কোনো সূফীর মতো কঠোর সাধনায় নিজেকে ঠেলে দিই নি। নির্জনবাসের আয়োজন করে কোনো চিল্লাকাশিও করি নি আর সুন্নত পরিপন্থি এমন কোনো বৈরাগ্য অবলম্বন করি নি যা সম্পর্কে খোদা তা'লার কালাম বা বাণীর কোনো আপত্তি থাকবে। বরং আমি সর্বদা এমন সব ফকির ও বিদআতপন্থীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলাম, যারা হরেক প্র কার বিদআতে লিপ্ত হয়। তবেআমার শ্রদ্ধেয় পিতার জীবদ্দশাতেই, যখন তাঁর মৃত্যুকাল খুবই সন্নি কটবর্তী ছিল, একদা এমন হলো, পবিত্র চেহারার অধিকারী একজন বয়োবৃদ্ধ বুযুর্গকে আমি স্বপ্নে দেখি। তিনি বলেন, ঐশী জ্যোতি আকর্ষণের জন্য রোযা রাখা নবী-পরিবারের সুন্নত; [অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার ঐশী জ্যোতিকে স্বাগত জানানোর জন্য রোযা রাখা নবীদের একটি রীতি। আল্লাহ্ তা'লা ইঙ্গিতে স্বপ্নযোগে তাঁকে অবহিত করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এই মর্যাদায় ভূষিত করতে যাচ্ছেন।] যাহোক, তিনি (আ.) বলেন, এটি উল্লেখ করে তিনি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন, আমি যেন নবী-রসূলদের পরিবারের এই সুন্নত পালন করি। কাজেই আমি কিছুকাল রোযা রাখা যথার্থ জ্ঞান করি। কিন্তু একইসাথে এই চিন্তাও ছিল, এই কাজটি গোপনে সম্পাদন করাই উত্তম হবে। তাই আমি এ পন্থা অবলম্বন করি যে, বাড়ি থেকে আমার খাবার পুরুষদের বসার ঘরে আনাতাম এবং এরপর সেই খাবার গোপনে কিছু এতীম শিশুকে দিয়ে দিতাম, যাদেরকে আমি আগে থেকেই যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বলে দিয়েছিলাম। এভাবে সারা দিন রোযায় অতিবাহিত হতো এবং খোদা তা'লা ছাড়া এসব রোযার কথা কেউ জানত না। দু-তিন সপ্তাহ পর আমি বুঝতে পারি, এভাবে এক বেলা ভরপেট আহার করে রোযা রাখায় আমার কোনো কষ্টই হচ্ছে না। তাই আহারের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দেওয়া শ্রেয় হবে। কাজেই, সেদিন থেকে আমি আহারের পরিমাণ কমাতে থাকি। এমনকি শেষ পর্য ন্ত আমি পুরো দিন-রাত মাত্র একটি রুটি খেয়েই পার করে দিতাম। আর এভাবে আমি আহারের পরিমাণ কমাতে থাকি; এক পর্যায়ে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সম্ভবত অষ্টপ্রহরে মাত্র কয়েক তোলা রুটিই ছিল আমার আহার্য। চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র সামান্য একটু রুটি খেতাম। প্রায় আট বা নয় মাস পর্যন্ত আমি এমনটিই করেছি। খাবারের এই চরম স্বল্পতা সত্ত্বেও- যা খেয়ে একটি দু-তিন মাসের শিশুও জীবন ধারণ করতে পারে না- আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রেখেছেন। আর সেই সময়ের রোযার নিদর্শমূলক অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে একটি হলো সেসব সূক্ষ্ম দিব্যদর্শন যা সেই সময়ে আমার কাছে উন্মেচিত হয়েছিল। যেমন, পূর্ববর্তী কতিপয় নবীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং এই উম্মতের উচ্চস্তরের যেসব 'আউলিয়া' গত হয়েছেন তাঁদের সাথেও সাক্ষাৎ হয়। একদা পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় হাসান, হুসাইন, আলী(রা.) ও ফাতিমা (রা.)-সহ জনাব রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দর্শন লাভ করি। এটি কোনো স্বপ্ন ছিল না বরং এক প্রকার জাগ্রত অবস্থা ছিল। মোটকথা, এভাবে অনেক পবিত্র মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হয়, যাদের কথা বলতে গেলে কথা দীর্ঘ হয়ে যাবে। এছাড়া আধ্যাত্মিক জ্যোতির্মালা রূপকভাবে সবুজ ও লাল বর্ণের স্তম্ভের আকারে এমন মনোহর ও চিত্তাকর্ষক রূপে দৃষ্টিগোচর হতো যা লিপিবদ্ধ করা সাধ্যাতীত। সেই জ্যোতির্ময় স্তম্ভগুলো সরাসরি আকাশ-পানে উঠে যাচ্ছিল, [অর্থাৎ ভূমি থেকে ওপরের দিকে যাচ্ছিল,] যার কিছু ছিল উজ্জ্বল শুভ্র এবং কিছু ছিল লাল। এগুলোর সাথে হৃদয়ের এমন এক গভীর সম্পর্ক ছিল যে, তা দেখে হৃদয় পরম প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। আর পৃথিবীতে এমন কোনো স্বাদ নেই, যেরূপ স্বাদ বা আনন্দ এগুলো দেখে হৃদয়ে ও অন্তরে সৃষ্টি হতো। আমার ধারণা, সেই স্তম্ভগুলো খোদা ও বান্দার ভালোবাসার সংমিশ্রণের এক রূপক বহিঃপ্রকাশ ছিল। অর্থাৎ একটি ছিল সেই জ্যোতি যা (বান্দার) হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছিল এবং অপরটি ছিল সেই জ্যোতি যা ওপর থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল; আর উভয়টি মিলে এক স্তম্ভের রূপ ধারণ করেছিল।" [অর্থাৎ, স্তম্ভ গুলো এমন ছিল যা নীচ থেকে ওপরে এবং ওপর থেকে নীচে আসছিল এবং পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে স্তম্ভের রূপ ধারণ করছিল।] এগুলো আধ্যাত্মিক বিষয় যা জগদ্বাসী চিনতে পারে না, কারণ এগুলো জগদ্বাসীর দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে। কিন্তু জগতে এমন মানুষও আছেন যারা এসব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন।"

তিনি আরও বলেন "মোটকথা এই সময়কাল পর্যন্ত রোযা রাখার ফলে আমার কাছে যেসব বিস্ময়কর বিষয় প্রকাশিত হয়েছিল তা ছিল বিভিন্ন প্রকার মুকাশিফাত বা দিব্যদর্শন। এছাড়া আমার আরেকটি লাভ হয়েছিল; এই কঠোর সাধনার পর আমি নিজ সত্তাকে এমন অবস্থায় পাই যে, প্রয়োজনে আমি দীর্ঘ সময় অনাহারে যাপন করতে পারি। আমি অনেকবার ভেবেছি, যদি কোনো স্থূলকায় ব্যক্তি- যে স্থূলতার পাশাপাশি একজন পালোয়ানও বটে- তাকে যদি আমার সাথে অনাহারে থাকতে বাধ্য করা হয়, তাহলে আমার আহারের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই সে মারা যাবে। এর মাধ্যমে আমি এই প্রমাণও পাই যে, মানুষ অনাহারে থাকার কল্যাণে কিছুটা উন্নতি করতে পারে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কারো দেহ এমন কষ্টসহিষ্ণু না হয়, আমার বিশ্বাস- এমন আরামপ্রিয় ব্যক্তি আধ্যাত্মিক মোকাম বা আধ্যাত্মিক মার্গ অতিক্রমের যোগ্য হতে পারে না।" কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, "তবে আমি প্রত্যেককে এরূপ করতে পরামর্শ দিচ্ছি না। আমি সবাইকে এটি করতে বলি না এবং আমিও নিজের ইচ্ছায় তা করি নি। এটি তো আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে করেছিলাম। আমি এমনও অনেক নির্বোধ দরবেশ দেখেছি, যারা কঠোর সাধনা করেছে এবং অবশেষে মস্তিষ্কের শুষ্কতার ফলে তারা উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।"অর্থাৎ মগজ শুকিয়ে যায় এবং মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং তাদের বাকি জীবন পাগলামিতে কেটেছে অথবা তারা যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়েছে। মানুষের মস্তিষ্কের শক্তি সমান হয় না। অতএব, প্রাকৃতিকভাবেই যেসব ব্যক্তি দুর্বল, তাদের জন্য কোনো প্রকার শারীরিক কঠোর সাধনা অনুকূল হতে পারে না এবং তারা অতি দ্রুত কোনো বিপজ্জনক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

যাইহোক, ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম, এছাড়া এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্যেরও ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, তাই সবাই যেন এই চেষ্টা না করে। আমি যা করেছি, তা প্রত্যেকেই করতে পারবে- এমনটি নয়। তাই উত্তম হলো, মানুষ যেন মনগড়া কথার অনুসরণে নিজেকে কঠোর সাধনায় ব্রতী না করে এবং 'দীনুল আজায়িয' (সাধারণ ধর্মাচার) অবলম্বন করে। [সাধারণের জন্য ধর্মের যে ছাড়গুলো রয়েছে বা সাধারণ যে ধর্মীয় বিষয়াদি রয়েছে, যেগুলো পালনের দায়িত্ব একজন মানুষের ওপর বর্তায়, বা সুন্নতের ওপর আমল করা- সে যেন এগুলোই অবলম্বন করে।] অবশ্য যদি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কোনো ইলহাম হয় এবং তা ইসলামের সমু জ্জ্বলজীবনবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তবে তা পালন করা আবশ্যক। কিন্তু আজকালকার অধিকাংশ অজ্ঞ পীর-ফকির যে কঠোর সাধনা শেখায়, তাদের পরিণাম ভালো হয় না। সুতরাং এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত।"

(কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ১৯৬)

এখনো কেউ কেউ বলে যে, এটা করো, ওটা করো; এমন লোকদের কথা মানা উচিত নয়। বরং আজকাল তো টিভি অনুষ্ঠানগুলোতেও এসব দেখানো হয়। মানুষের দেখা উচিত, মধ্যপন্থা কী এবং সেটি অবলম্বন করা উচিত। আর নিজের যতটুকু সাধ্য রয়েছে, সে অনুযায়ী আল্লাহ্‌র ও বান্দার অধিকার আদায় করার চেষ্টা করা উচিত এবং ইবাদতের যে পদ্ধতি ও ন্যূনতম মান মহানবী (সা.) বলে দিয়েছেন, তা অবশ্যই অর্জ ন করার চেষ্টা করা উচিত আর এরপর তাতে উন্নতি করতে থাকা উচিত। ধীরে ধীরে উন্ন তিও সাধিত হয়। কিন্তু যাইহোক, ইসলাম অকারণে নিজেকে কষ্টে নিপতিত করতে নিষেধ করেছে এবং তিনি (আ.)ও এটি নিষেধ করেছেন।

শৈশব থেকে তাঁর অবস্থা কেমন ছিল- সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মিস্ত্রী ফকীর মুহাম্মদ সাহেব বলেন, "আমার বাবা, যাঁর নাম ছিল 'জীওয়া', তিনি শোনাতেন যে, একবার মির্যা সাহেব ছাদ থেকে পড়ে যান এবং প্রচণ্ড আঘাত পান। আমরা জানতে পারি, মির্যা সাহেব ছাদ থেকে পড়ে গেছেন। তাই আমরা তাঁর খোঁজখবর নেবার জন্য যাই। তাঁর জ্ঞান ফিরলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, নামাযের সময় হয়েছে কি না। নামাযের প্রতি তাঁর এতটাই ভালোবাসা ছিল! আমি তখন ছোট ছিলাম যখন তিনি এই কথা শোনাতেন।"

(রেজিস্টার রেওয়ায়েত সাহাবা, অপ্রকাশিত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৮)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব ডা. মীর মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। (তিনি বলেন,) ১৮৯৫ সালে যখন রমযান মাস কাদিয়ানে অতিবাহিত করার সুযোগ হয়, আমি পুরো মাস হুযূর (আ.)-এর পেছনে তাহাজ্জুদ নামায অর্থাৎ তারাবীহ্ আদায় করি। তাঁর অভ্যাস ছিল, বিতর রাতের প্র থমাংশেই পড়ে নিতেন এবং দুই রাকআত করে তাহাজ্জুদ নামাযের আট রাকআত রাতের শেষাংশে আদায় করতেন; যার মাঝে তিনি সর্বদা প্রথম রাকআতে আয়াতুল কুরসী অর্থাৎ ***'আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুআ*** থেকে ***'ওয়া হুআল আলিউল আলীম'*** পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন আর রুকু ও সিজদায় 'ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম বি রাহমাতিকা আসতাগিস' দোয়াটি প্রায় পাঠ করতেন। তিনি এমন স্বরে পড়তেন যে, আমি তা শুনতে পেতাম। অর্থাৎ ধীরে ধীরে পড়তেন যা উচ্চ স্বরও ছিল না আবার একদম ক্ষীণও না।তাছাড়া তিনি সর্বদা তাহাজ্জুদ নামাযের পর সেহরী খেতেন এবং এতে এত দেরি করতেন যে, কখনো কখনো খেতে খেতে আযান হয়ে যেত এবং তিনি কোনো কোনো সময় আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত খাবার খাওয়া অব্যাহত রাখতেন।"

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন, আসল বিষয় হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহে সাদিক পূর্ব দিগন্তে উদয় না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেহরী খাওয়া বৈধ। আযানের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা ফজরের আযানের

সময়টিই সুবহে সাদিক উদিত হবার ওপর নির্ধারিত; তাই লোকেরা সাধারণত আযান হওয়াকে সেহরীর (শেষ সময়) মনে করে নেয়। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন, কাদিয়ানে যেহেতু ফজরের আযান সুবহে সাদিক হতেই হয়ে যায় এবং এটিও সম্ভব, কখনো কখনো ভুল বা অসতর্কতাবশত তার আগেই হয়ে যায়, তাই এমন সব ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আযানের তেমন পরোয়া করতেন না এবং সুবহে সাদিক প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত সেহরী খেতে থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে শরীয়তের উদ্দেশ্যও এই বিষয়ে এটি নয় যে, যখন বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক হিসাবে সুবহে সাদিক শুরু হবে, তার সাথে সাথেই খাবার বর্জন করতে হবে; বরং উদ্দেশ্য হলো, যখন সাধারণের দৃষ্টিতে ভোরের শুভ্রতা প্র কাশ পায়, তখন খাবার ত্যাগ করা উচিত। বস্তুত 'তাবাইয়্যুন' (সুস্পষ্ট হওয়া) শব্দটি এই বিষয়টিই প্রকাশ করছে। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'বেলালের আযানে সেহরী ত্যাগ কোরো না, বরং ইবনে মাকতুমের আযান পর্যন্ত নিঃসন্দেহে পানাহার করতে থাকো।' কারণ ইবনে মাকতুম অন্ধ ছিলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত লোকজনের মাঝে শোরগোল না পড়ে যেত যে, 'সকাল হয়ে গেছে', ততক্ষণ পর্য ন্ত তিনি আযান দিতেন না।" (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ: ২৯৫-২৯৬)

যাইহোক, এখন তো যুগ আরো আধুনিক হয়ে গিয়েছে এবং আধুনিক যন্ত্র পাতির সাহায্যে সুবহে সাদিকের সঠিক সময়ও জানা যায়। তাই সাধারণত আযানের শেষ সময়সীমা নির্ধারিত থাকে আর চেষ্টাও এটিই করা হয়। কখনো কখনো হতে পারে যে, ভুলও হয়ে যায়; কিন্তু যদি কোথাও ভুলবশত আযান আগেও হয়ে যায়, তাহলেও নীতি তা-ই হবে যা বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু রমযান মাসও শুরু হতে যাচ্ছে, তাই এই এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়ে দিলাম। কিন্তু মানুষের এতটাও শিথিল হওয়া উচিত নয় যে, তারা তাকিয়ে থাকবে- দিন হয়েছে নাকি হয় নি! যাহোক, আমাদের আযান এবং সময়সূচি ভালোভাবে হিসাব-নিকাশ করে এবং উত্তম গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর যেহেতু বর্তমান যুগ সেই যুগের চেয়ে অধিক বৈজ্ঞানিক যুগ, তাই ভুলের সম্ভাবনা সাধারণত কম থাকে। এ কারণে সেই সময়সূচিই অনুসরণ করা উচিত এবং তার ওপরই আমল করা উচিত, যা প্রতিটি এলাকা ও দেশের সময়সূ চি অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন যে, মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে একবার 'নামাযে ইস্তিস্কা' (বৃষ্টির জন্য নামায) পড়া হয়েছিল, যাতে হুযূর (আ.) অংশ নিয়েছিলেন এবং সম্ভবত মরহুম মৌলভী মুহাম্মদ হাসান সাহেব ইমামতি করেছিলেন। লোকেরা এই নামাযে অনেক কান্নাকাটি করেছিল, কিন্তু হুযূর (আ.)-এর আত্মসংযম ছিল পরম মার্গের; তাই আমি তাঁকে কাঁদতে দেখি নি। আমার মনে আছে, এরপর খুব শীঘ্রই মেঘ জমে বৃষ্টি হয়েছিল; বরং সম্ভবত সেই দিনই বৃষ্টি হয়েছিল।" (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ: -৩৯৩)

যাইহোক, এতে কেউ যেন এমনটি মনে না করে যে, তিনি (আ.) নামাযে প্রকাশ্যে কাঁদতেন না। তাঁর মনিব (সা.)-এর অনুসরণে তাঁর ইবাদতের এমন বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, সিজদারত অবস্থায় তাঁর বুক থেকে এমন শব্দ আসত যেন টগবগ করে হাঁড়ি ফুটছে। তিনি সিজদায় পড়ে থাকতেন এবং অত্যন্ত বেদনার সাথে কান্নাকাটি ও আহাজারি করতে থাকতেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব হযরত আম্মাজান নুসরাত জাহান বেগম সাহেবার রেওয়ায়েত উল্লেখ করেন যে, আমাদের মাতা বর্ণনা করেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া সাধারণত দুই ধরনের নফল পড়তেন। একটি হলো দুই বা চার রাকআত ইশরাকের নামায, যা তিনি মাঝেমধ্যে পড়তেন, এতে তিনি নিয়মিত ছিলেন না। আর দ্বিতীয়টি হলো আট রাকআত তাহাজ্জুদের নামায, এটি তিনি নিয়মিত পড়তেন; তবে খুব বেশি অসুস্থ হলে ভিন্ন কথা। কিন্তু এমতাবস্থায়ও তিনি তাহাজ্জুদের সময় বিছানায় শুয়ে শুয়েই দোয়া করে নিতেন এবং শেষ বয়সে দুর্বলতার কারণে সাধারণত বসে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ১ভাগ, পৃ: ৪)

হযরত মৌলভী ইয়াকুব আলী সাহেব লেখেন, যখন তিনি মামলা পরিচালনার জন্য যেতেন, নিজ পিতার প্রতি আনুগত্যের দায়িত্ব পালন করার জন্যই যেতেন। সেখানে তিনি এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন যে মামলা চলাকালে কোনো নামায যেন কখনো কাযা না হয় এবং তিনি কখনো কাযা করেনওনি। একইভাবে তিনি সেইসব আবশ্যিক কর্তব্যের প্রতিও উদাসীন হতেন না যা আল্লাহ্ তা'লার অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত।

ঠিক আদালতে থাকা অবস্থায়ও তিনি নামাযের ওয়াক্তে এমনভাবে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন যেন তাঁরঅন্য কোনো ব্যস্ততাই নেই। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, তিনি (আ.) নামাযে নিমগ্ন আছেন এবং অন্যদিকে মামলার জন্য ডাক পড়ে গেছে, কিন্তু তিনি (আ.) পূর্বের মতোই প্রশান্ত চিত্তে নামাযে রত। একবার তিনি (আ.) বলেন, 'আমি বাটালায় একটি মামলার (হাজিরার) জন্য গিয়েছিলাম। তখন নামাযের সময় হয়ে গেলে আমি নামায পড়তে শুরু করলাম। [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামায পড়া শুরু করলেন।] পিয়ন ডাক দিল, কিন্তু আমি নামাযে ছিলাম। দ্বিতীয় পক্ষ হাজির হয়ে যায় এবং সে একপক্ষীয় কার্যক্রমের সুযোগ নিতে চাইল যে, বিবাদী পক্ষ হাজির হয় নি, তাই একতরফা রায় দেওয়া হোক। এর ওপর অনেক জোর দিল। কিন্তু আদালত কোনো ভ্রুক্ষেপ করে নি। মামলার রায় তার বিপক্ষে দিয়ে আমার পক্ষে ডিক্রি দিয়ে দেয়, অর্থাৎ আমার পক্ষে রায় দিয়ে দিল। আমি যখন নামায শেষ করে (আদালতের কক্ষে) গেলাম, তখন আমার ধারণা ছিল, হয়ত জজ সাহেব (তথা মামলার বিচারক) আমার অনুপস্থিতিকে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকবেন। [কেননা আইন হলো, এক পক্ষ উপস্থিত না থাকলে তার বিপক্ষে রায় দিয়ে দেওয়া হয়।] কিন্তু আমি যখন উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি তো নামায পড়ছিলাম, তখন তিনি (জজ সাহেব) বললেন, 'আমি তো আপনার পক্ষে রায় প্রদান করেছি'।

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ১ভাগ, পৃ: ৮৭)

এটাও ইবাদতের কল্যাণ যে, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে অনুগ্রহ করেছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব হযরত আম্মাজানের আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বাড়িতে মাগরিবের নামায পড়াতেন, তখন প্রায়ই সূরা ইউসুফের সেই আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন যাতে এই বাক্য রয়েছে: اِنَّمَآ اَشۡكُوۡا بَثِّیۡ وَحُزۡنِیۡۤ اِلَی اللّٰہِ (সূরা ইউসুফ: ৮৭)। (অর্থাৎ) আমি তো আমার কষ্ট ও দুঃখ শুধু আল্লাহ্ তা'লার কাছেই নিবেদন করি।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন, আমি এখানে বলে রাখছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কণ্ঠস্বরে ছিল বেদনা ও আর্তি এবং তিনি (আ.) সুললিত সুরে তিলাওয়াত করতেন।

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ১ভাগ, পৃ: ৬১, রেওয়াতে নম্বর-৮৫)

অনুরূপভাবে, মির্যা মুহাম্মদ দীন সাহেব বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আ.) মসজিদে ফরয নামায আদায় করতেন, তবে সুন্নত ও নফল নামাযগুলো বাড়িতেই পড়তেন। এশার নামাযের পর তিনি (আ.) ঘুমিয়ে পড়তেন এবং মধ্যরাতে জেগে তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। এরপর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি (আ.) মাটির প্রদীপ জ্বালাতেন এবং ফজরের আযান পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন।

(রোজনামা আল ফজল, কাদিয়ান, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪১, পৃ: ৮৫)

অন্য একজন জীবনীকার লিখেছেন যে, তাঁর (আ.) পবিত্র কুরআন ও মহানবী(সা.)-এর সুন্নতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল এবং তাঁর সমস্ত ইবাদত কখনো কুরআন ও সুন্নতের বাইরে ছিল না।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাশাপাশি তাহাজ্জুদের নামায নিয়মিত আদায় করতেন। ইশরাকের নামাযও পড়তেন, কিন্তু তাহাজ্জুদের নামাযের প্রতি ছিল অত্যধিক ভালোবাসা। নামাযে তাঁর আল্লাহ্র প্র তি মনোনিবেশ এবং নিমগ্নতা এতটাই প্রবল ও গভীর হতো যে, মনে হতো, তিনি (আ.) এ জগতেই নেই। তাহাজ্জু দের নামাযে সূরা ফাতিহা অত্যন্ত বেদনা ও মনোযোগ সহকারে পড়তেন এবং অনেক বেশি দোয়া করতেন।শুরুতে কখনো কখনো নামাযে যদি মনোযোগ সৃষ্টি না হতো তখন তিনি (আ.) বারবার নামায পড়তেন এবং বলতেন: এই পদ্ধতি আমি এক মদ্যপ থেকে শিখেছি। তিনি (আ.) বলেছেন, একবার নামাযে পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছিল না। তাই আমি জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হলাম যে, সেখানে গিয়ে নামায পড়ব। যাহোক, পথে একটি বাজার ছিল। সেখানে এক হিন্দু তার এক বন্ধুকে বলছিল, রাতে আমি এক পেয়ালা মদ পান করেছি, কিন্তু নেশা হলো না। অতঃপর দ্বিতীয় পেয়ালা পান করেছি তবুও নেশা না হলে তৃ তীয়পেয়ালা পান করি। মোটকথা সে এভাবে বার বার পান করতে থাকল, এমনকি শেষ পর্যন্ত নেশা সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি (আ.) বলতেন, আমি ভাবলাম, আমিও বার বার নামায পড়ব যতক্ষণ না আধ্যাত্মিক নেশা সৃষ্টি হয়।" (ডক্টর বাশারাত আহমদ রচিত মুজাদ্দিদে আজাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬)

[ফরয নামায তো এভাবে (এতবার) পড়া যাবে না, তাই নফলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল।] নফল নামায সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, বার বার পড়ব, যতক্ষণ না পূর্ণ মনোসংযোগ হয়।

নামাযের পাশাপাশি তাঁর নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, দরূদ পাঠ এবং ইস্তেগফার করার অভ্যাস ছিল। পবিত্র কুরআনের প্রতি তো তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল, তিনি (আ.) তো দিনে-রাতে, উঠতে-বসতে এবং হাঁটতে-চলতেও পড়তেন এবং অঝোরে কাঁদতেন, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি। যদিও সেখানে (তথা ইস্তিসকার) নামাযে কাঁদেন নাই, তবে এর অর্থ এটি নয় যে, তিনি কাঁদতেন না। তিনি কাঁদতেন, কুরআন শরীফ পাঠ করেও তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে যেতেন। দরূদ অজস্র ধারায় পড়তেন, বুঝে বুঝে এবং এত গভীর বেদনার সঙ্গে পাঠ করতেন যে, অনেক সময় এর সাথে ক্রন্দন ও অঝোর অশ্রুপাতও দেখা যেত।

একবার ইশরাকের নামায পড়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেন; এখানে প্রথমে তিনি মধুর গুরুত্ব ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা

করেন আর কথা শেষ পর্যন্ত ইবাদতের বিষয়ে গিয়ে পর্যবসিত হয়। মধু ও ডায়াবেটিস রোগ প্রসঙ্গে কথা ওঠে যে, ডায়াবেটিস রোগে মধু খাওয়া উচিত কি না। তিনি (আ.) বলেন, ডায়াবেটিসের কারণে আমি খুব কষ্টে ছিলাম। ডাক্তাররা এতে মিষ্টি খুবই ক্ষতিকর বলে আখ্যা দেন। অর্থাৎ ডায়াবেটিস রোগীর জন্য মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া খুবই ক্ষতিকর। তিনি বলেন, আজ আমি এ বিষয়ে চিন্তা করছিলাম। আমার মনে হলো, বাজারের যে সকল চিনি ইত্যাদি পাওয়া যায় তা প্রায়ই অসৎ লোকেরা প্রস্তুত করে থাকে; যদি তা ক্ষতিকর হয়ে থাকে এতেআশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু 'আস্‌ল্' অর্থাৎ মধু তো আল্লাহ্‌র ওহীর মাধ্যমে তৈরি হয়, তাই এর গুণাগুণ অন্যান্য মিষ্টির মতো কখনোই হতে পারে না। যদি তা সেগুলোর মতো হতো, তবে সব মিষ্টি সম্পর্কে 'শিফাউল্ লিন্নাস' (মানুষের জন্য আরোগ্য) বলা হতো; কিন্তু কুরআনে শুধু এটিকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ বিশেষত্ব ই এর উপকারিতার প্রমাণ। যেহেতু এর প্রস্তুতি ওহীর মাধ্যমে হয়, তাই যে মৌমাছি ফুল থেকে রস সংগ্রহ করে, নিশ্চয়ই তা উপকারী উপাদানই গ্রহণ করে। এটি ভেবে আমি সামান্য মধুর সঙ্গে কেওড়া মিশিয়ে পান করি। কিছুক্ষণ পরেই আমি খুবই ভালো বোধ করি, এমনকি আমি চলাফেরার শক্তি লাভ করি। [আগে ডায়াবেটিসের কারণে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।] এরপর আমি বাড়ির লোকদের নিয়ে বাগান পর্যন্ত চলে যাই এবং সেখানে ইশরাকের দশ রাকআত নামায আদায় করি।

(মালফুযাত, খণ্ড-৭, পৃ: ৩৪-৩৫)

হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব বর্ণনা করেন, একবার ভয়াবহ ভূমিকম্প দেখা দেয়। সকল ঘরবাড়ি ও জিনিসপত্র কেঁপে ওঠে, মানুষ আতঙ্কিত ও বিচলিত হয়ে ঘাবড়ে যায়। এমন সময়ে আল্লাহ্‌র মসীহ্‌র অবস্থা দেখার মতো ছিল। কেননা আমরা হাদীসে পড়েছি, এমন কোনো দৈব-বিপর্যয় ঘটলে মহানবী (সা.)-এর চেহারায় খোদাভীতির গভীর প্রভাব প্রকাশ পেত; সামান্য মেঘ দেখলেও তিনি অস্থির হয়ে যেতেন- কখনো বাইরে যেতেন, কখনো ভেতরে আসতেন। সে সময়ও আল্লাহ্‌র নবী "হার কে আরেফ - তার আসত, তারসাঁ তার"- প্রবাদটিকে কার্যত সত্য করে দেখান। এটি একটি ফারসি প্রবাদ। এর অর্থ হলো, যে যত বেশি তত্ত্ব জ্ঞানী হয় তথা আল্লাহ্‌কে চেনে, সে তত বেশি আল্লাহ্‌কেভয় করে। যাহোক, ভূমিকম্প শুরু হতেই তিনি পরিবার-পরিজনসহ আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়ায় মশগুল হন এবং নিজ প্রভুর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি পুরো পরিবার ও খাদেমগণ সমেত কিয়াম, রুকু ও সিজদায় পড়ে থাকেন এবং আল্লাহ্‌র অমুখাপেক্ষী বৈশিষ্ট্যের কথা ভেবে ভীত ও ত্রস্ত থাকেন।"

(যিকরে হাবীব, প্রণেতা-হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব, পৃ: ১০২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বাজামা'ত নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আজকাল মানুষ যেহেতু দূরে দূরে বসবাস করে এবং মসজিদে আসা কঠিন ছিল; [সেই যুগের দূরত্বের নিরিখে কথা হচ্ছে আর তখন বাহনও ছিল না; তাই লোকেরা ঘরে আলাদা নামায পড়ে নিত;] হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ঘরে একা নামায পড়া উচিত নয়; বরং বাজামা'ত পড়া উচিত। তিনি বলেন, "বাজামা'ত নামায পড়ার একটি ধরন হলো, স্ত্রীসন্তানদের সাথে নিয়ে ঘরেই বাজামা'ত নামায আদায় করা। [যদি মসজিদে যাওয়া সম্ভব না হয়, তবে ঘরেই বাজামা'ত নামায পড়ে নাও।] তিনি (রা.) বলেন, যেহেতু দূরত্বের কারণে আলাদা নামায পড়ার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে এবং মানুষের অন্তরে বাজামা'ত নামাযের গুরুত্ব কমে গিয়েছে, তাই এই অভ্যাস পরিত্যাগ করো এবং বাজামা'ত নামায আদায়ের অভ্যাস সৃষ্টি করো। আমরা এ যুগেও এই দৃশ্য দেখতে পাই। আজও যে-সব স্থানে ঘাটতি আছে সেখানে মানুষজনের সচেতন হওয়া উচিত- ঘরে সন্তানদের নিয়ে নামায আদায় করুন। এতে শিশুদের মধ্যেও নামাযের অভ্যাস গড়ে উঠবে। তারপর তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদাহরণ দিয়েছেন যে, তিনি যখন মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতে পারতেন না তখন তিনি ঘরেই জামা'তে নামায পড়াতেন। আর এটি খুবই বিরল, কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়া তিনি একা নামায পড়তেন না। প্রায়ই তিনি আমাদের মাকে সঙ্গে নিয়ে জামা'ত করাতেন এবং মায়ের সঙ্গে অন্য মহিলারাও অংশগ্রহণ করতেন।(আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৬, পৃ: ৪৯৩)

হযরত সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওয়ালিউল্লাহ্ শাহ সাহেবের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৩৫ সালে আমি সিয়ালকোটে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার সাক্ষাৎ হয় এক অতি বৃদ্ধা মহিলা মাঈ হায়াত বিবির সঙ্গে। তিনি ছিলেন ফযল দীন সাহেবের কন্যা এবং হাফেয কারী মুহাম্মদ শফী সাহেবের শ্রদ্ধেয়া মাতা। তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হলে দেখি, মাঈ সাহেবা নিজ বাড়ির দোরগোড়ায় বসে ছিলেন। আমরা তাকে চিনতে পারি নি, কিন্তু তিনি আমাদের চিনে ফেললেন। সালাম দিয়ে বললেন, এদিকে চলে আসুন। মাঈ সাহেবার বয়স তখন ছিল ১০৫ বছর। তিনি জানান, সিপাহি বিদ্রোহর সময়ে এখানে যখন ভয়াবহ অরাজকতা চলছিল, [তিনি নিজের বয়সের কথা বলছেন আর বলেন,] অফিস ও আদালতে আগুন লাগানো হচ্ছিল, সেসময় আমি যুবতী ছিলাম। একথা উল্লেখ করার পর কথোপকথনে র এক পর্যায়ে মাঈ সাহেবা বলেন, মির্যা সাহেব অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে তার পরিচয় তখন থেকেই, যখন তিনি প্রাথমিক দিনগুলোতে সিয়ালকোটে আসেন এবং এখানে চাকরির সুবাদে অবস্থান করেন। তিনি বলেন, তখন মির্যা সাহেব বয়সের এমন পর্য ায়ে ছিলেন যখন সবেমাত্র মুখে দাড়ি-গোঁফ গজাতে শুরু করেছে, পূর্ণ দাড়ি হয় নি। সিয়ালকোটে আগমনের পর হযরত মির্যা সাহেব আমার পিতাকে বাড়িতে এসে ডাক দেন এবং বলেন, মিয়া ফযল দীন সাহেব! আপনার যে দ্বিতীয় বাড়িটি আছে, তা আমার থাকার জন্য দিয়ে দিন। [অর্থাৎ ভাড়া নিতে চাচ্ছিলেন।] আমার পিতা দরজা খুললে তিনি ভেতরে প্রবেশ করেন। আমার পিতা পানি, খাট, জায়নামায ইত্যাদি রাখেন, এর সাথে মির্যা সাহেবের জিনিসপত্রও ভেতরে রাখেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অভ্যাস ছিল- কোর্ট কাচারি থেকে ফিরে প্রথমে আমার পিতাকে ডাকতেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেন। মির্যা সাহেবের অধিকাংশ সময়ই আমার পিতার সঙ্গে কাটত। তাঁর খাবারও আমাদের বাড়িতেই রান্না হতো এবং আমার পিতাই সে খাবার মির্যা সাহেবের নিকট পৌঁছে দিতেন। মির্যা সাহেব ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করতেন এবং আঙিনায় গিয়ে কুরআন তিলাওয়াতে লেগে যেতেন। আমার পিতা বলতেন, তিনি কুরআন মজীদ পড়তে পড়তে কখনো সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন, দীর্ঘ সিজদা করতেন এবং এত কাঁদতেন যে, মাটি ভিজে যেত। মাঈ সাহেবা হযরত মসীহ্ মওউদের কথা বলতে গিয়ে বার বার বলেন, আমার প্রাণ তাঁর জন্য উৎসর্গিত! তিনি এ সাক্ষ্য তার ছেলের উপস্থিতিতে দিয়েছিলেন।

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ: ৫৯৪-৫৯৫)

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব, মৌলভী মীর হাসান সাহেবের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন- যিনি ড. আল্লামা ইকবাল সাহেবের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বলেন, হযরত মির্যা সাহেব প্রথমে কাশ্মীরি মহল্লায়- যা এই অধমের বাসার নিকটেই অবস্থিত- উমরা নামক এক কাশ্মীরির বাড়িতে ভাড়ায় থাকতেন। কোর্ট কাচারি থেকে ফিরে তিনি কুরআন মজীদ তিলাওয়াতে মগ্ন হয়ে যেতেন; কখনো বসে, কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো হেঁটে হেঁটে তিলাওয়াত করতেন এবং অঝোরে কাঁদতেন। এমন বিনয়াবনতচিত্তে তিলাওয়াত করতেন যার তুলনা পাওয়া ভার। যুগের প্রথা অনুযায়ী মানুষ তাদের আদালতের কাজের জন্য বা সুপারিশের জন্য তাঁর কাছে আসত, যেমনটা সাধারণত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে আসা হয়, যেন মামলার রায় তাদের পক্ষে যায়। মানুষের এমন অভ্যাসই হয়ে থাকে,তারা সুপারিশের জন্য চলে আসে আদালতে কর্মরত কোনো ব্যক্তির কাছে। তিনি লেখেন, ঘরের মালিক উমরার বড়ো ভাই ছিলেন ফযল দীন সাহেব যাকে সেই এলাকায় সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। একবার এমন কিছু মানুষকে কাচারিতে তার কাছে বসে থাকতে দেখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মিঁয়া ফযল দীন সাহেবকে ডেকে বলেন, এই মানুষগুলোকে বুঝিয়ে দিন- তারা যেন এখানে এসে নিজেদের সময় নষ্ট না করে, আর আমারও সময় নষ্ট না করে। আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমি বিচারক নই। আমার সাথে যতটা কাজের সম্পর্ক আছে আমি আদালতেই তা করে আসি। এরপর মিয়াঁ ফযল দীন সাহেব তাদের বিষয়টি বুঝিয়ে বিদায় করে দেন।

(হায়াতে আহমদ, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ: ৩৭০-৩৭১)

পাটিয়ালার জনৈক অআহমদী মুন্সী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কুরআন তিলাওয়াতের বিষয়ে বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মাত্র চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই সারাদিন কুরআন শরীফ পড়তেন এবং এর টীকায় নোট লিখতেন।

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, ছোটোবেলাতেই তঁ ার পিতার জীবদ্দশায় তাঁর এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় যে, দুনিয়ার থেকে তাঁর মন উঠে যায়। একান্ত শৈশবেই তাঁর সমস্ত ইচ্ছা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের দিকেই নিবদ্ধ ছিল।তাঁর (আ.) জীবনীকার শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব শৈশবের একটি বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখ করে লিখেছেন, শৈশবে যখন তাঁর বয়স খুবই কম ছিল তখন তিনি সমবয়স্ক খেলার সাথি এক মেয়েকে বলেছিলেন, যার সাথে তাঁর পরবর্তীতে বিবাহও হয়েছিল- তাকে বলতেন, হে হতভাগি! দোয়া করো যেন আল্লাহ্ আমাকে নামায পড়ার সৌভাগ্য দান করেন। এই বাক্যটি- যা অতি শৈশবকালের- তা থেকে বুঝা যায়, নিতান্ত শৈশব থেকেইতাঁর আবেগ-অনুভূতি কেমন ও কোন অভিমুখী ছিল! তাঁর আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু আশ্চর্যজনকভাবে কেবল আল্লাহ্ তা'লাকে কেন্দ্র করে ছিল! একইসাথে তাঁর সেই উন্নত বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় পাওয়া যায় যা শৈশব থেকেই তাঁর মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল, কেননা এ বাক্য থেকে বুঝা যায়- সেসময়ও তিনি সমস্ত আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নকারী হিসাবে আল্লাহ্ তা'লাকেই জানতেন। অর্থাৎ নামায পড়ার আকাঙ্ক্ষা করা এবং এই আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী আল্লাহ্ তা'লাকেই মনে করা এবং এরপর এমন এক ঘরে প্রতিপালিত হওয়া- যেখানকার ছোটো-বড়ো সবাই দুনিয়াকেই নিজেদের

উপাস্য মনে করত- [তা সত্ত্বেও তার মুখ থেকে] এমন কথা বের হওয়া এমন একটি হৃদয়ের পক্ষেই সম্ভব যা দুনিয়ার সংমিশ্রণ থেকে সর্বতোভাবে পবিত্র এবং পৃথিবীতে এক বৈপ্ল বিক পরিবর্তন সাধনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত।"

[হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব রচিত 'সীরাত মসীহ মওউদ (আ.), পৃ: ৯]

হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন: 'আমি ছোটবেলা থেকেই রোযা রাখতে অভ্যস্ত। শৈশবে একবার রোযা রাখলাম, অসুস্থ হয়ে পড়লাম; কিন্তু এরপর উনত্রিশটি রোযা পূর্ণ রাখলাম, কোনো কষ্ট হলো না। তখন আমার জন্য খুশির ঈদ ছিল। রোযার বিশেষ কল্যাণ রয়েছে; যেমন প্রতিটি ফলের আলাদা স্বাদ রয়েছে, তেমনই প্রতিটি ইবাদতের আলাদা স্বাদ রয়েছে। এসব ইবাদতের মাঝে এমন আধ্যাত্মিকতা রয়েছে যা মানুষের জন্য ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যদি আগ্রহ থাকে তবে দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণা কমে যায়। যা আবশ্যক তা হলো, ইবাদতের সময় মানুষের আত্মা অত্যন্ত বিগলিত হয়ে পানির মতো প্রবাহিত হয়ে খোদার সাথে গিয়ে মিলিত হওয়া।' (মুফতি মহম্মদ সাদিক রচিত 'যিকরে হাবীব', পৃ: ১৯৩)

যমীনদার পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত নেতা জাফর আলী খান সাহেবের পিতা মৌলভী সিরাজুদ্দীন সাহেব হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিয়ালকোটে অবস্থানকালীন ব্যস্ততা সম্পর্কে লেখেন, ১৮৭৭ সালে আমাদের এক রাত কাদিয়ানে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। সেসব দিনেও ইবাদত ও যিকরে তাঁর নিমগ্নতা এত গভীর ছিল যে, মেহমানদের সাথেও কম কথাবার্তা বলতেন।" (হায়াতে আহমদ, ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ: ৩৭৪)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানীর বরাতে আরো একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন: ১৯০০ সালের ঈদুল আযহার একদিন পূর্বে- যা হজ্জের দিন ছিল- হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালকে বলেন, 'আমি হজ্জের এই দিনটি বিশেষ দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করতে চাই। তাই যেসব বন্ধু দোয়ার আবেদন করতে চায়, আপনি তাদের নাম নিয়ে এবং তালিকা তৈরি করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।' হযরত ভাই সাহেব বর্ণনা করেন, সেদিন হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকাশে দোয়ার প্র চুর আবেদন পৌঁছায় এবং কতিপয় সাহাবী সরাসরিও দোয়ার আবেদন লিখে হুযূরের সমীপে পাঠান। আর যেহেতু সেই যুগে ঈদের সময় বাইরের স্থানগুলো থেকেও অনেক বন্ধু ঈদের নামায পড়তে এবং হযরত মসীহ্ মওউদের সাক্ষাতে ধন্য হবার জন্য কাদিয়ান চলে আসতেন, তাঁরাও উর্ধ্বলোক থেকে প্রদত্ত এই ব্যবস্থার অংশ হয়ে যান। আর এই দিনটি কাদিয়ানে বিশেষ দোয়া, অসাধারণ বিনয়াবনত প্রার্থনা এবং মহান বরকতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।"

(সীরাতে তইয়েবা, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ২০৪)

বাজামা'ত নামায পড়ার প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হতো- তা বর্ণনা করতে গিয়ে এক বৈঠকে তিনি (আ.) বলেন, আমার মাথা-ঘোরার অবস্থা আজও ভালো নয়, মাথা ঘুরছে; [অর্থাৎ মাথা-ঘোরার অসুস্থতা ছিল;] যখন জামা'তের অর্থাৎ বাজামা'ত নামাযের সময় হয় তখন মনে এই চিন্তার উদয় হয় যে, সবাই (নামাযের) জামা'তে থাকবে, কিন্তু আমি শামিল হতে পারব না- [অর্থাৎ মানুষজন সবাই একত্রিত হবে, বাজামা'ত নামায আদায় হবে, কিন্তু আমি শামিল হবো না!]- তখন (এটি ভেবে) খুবই দুঃখ হয়। এজন্য কষ্টেসৃষ্টে হলেও চলে আসি।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১)

আজও মাথা ঘুরছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও যেভাবে পারি, কষ্ট করে কোনোক্রমে মসজিদে চলেই এসেছি। তিনি বলেন, যা-ই হোক, চেষ্টাচরিত্র করে আমি মসজিদে চলে আসি। আর কেবল একবারের ঘটনা নয় এটি, অনেকবার এরূপ ঘটে; আজও এমনটিই হয়েছে। অর্থাৎ অসুস্থতার দিনগুলোতেও তিনি (আ.) বাজামা'ত নামায পড়ার চেষ্টা করতেন।

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি বলেন, তাঁর সাক্ষাতের স্থান সাধারণত মসজিদই হয়ে থাকে। তিনি যদি অসুস্থ না থাকেন তবে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'তের সাথে পড়েন এবং জামা'তের সাথে নামায পড়ার জন্য অত্যন্ত তাগিদ দেন। এবং তিনি বার বার বলেছেন, জামা'তের সাথে নামায না পড়া হলে আমি যতটা দুঃখ পাই, অন্য কোনো বিষয়ে আমি ততটা দুঃখ পাই না। মৌলভী সাহেব আরো লেখেন, আমার মনে আছে, যখন মানুষের আসা-যাওয়া কম ছিল, তিনি খুব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতেন, হায়! যদি আমাদের নিজস্ব একটি জামা'ত হতো, যাদের সাথে মিলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া যেত! আর তিনি বলতেন, আমি দোয়া করছি এবং আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া কবুল করবেন। এখন [অর্থাৎ মৌলভী সাহেবের একথা লেখার সময়] আল্লাহ্‌র কৃপায় নামাযীর সংখ্যা আশি-নব্বইজন হয়।

[বর্তমানে তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিটি দেশে আমাদের মসজিদও রয়েছে; তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমরা যেন আমাদের মসজিদগুলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী দিয়ে পূর্ণ করি এবং প্রতিটি নামায জামা'তের সাথে পড়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করি।]

মৌলভী সাহেব লেখেন, নামায আদায় করার পর তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ভেতরে চলে যেতেন এবং লেখালেখির কাজে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। এরপর মাগরিবের নামাযের পর তিনি মসজিদে বসে থাকতেন এবং বন্ধুদের সাথে মিলে সেখানেই খাবার খেতেন এবং এশার নামায পড়ে ভেতরে যেতেন।

(সীরাত হযরত মসীহ মওউদ, প্রণেতা- হযরত আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটী, পৃ: ৪৩)

হযরত আব্দুর সাত্তার সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত সাহেবের দাবির পূর্বে - যখন ছোটো মসজিদ বা মসজিদে মুবারক নির্মিত হয়- হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার জামা'ত পড়াতেন। আমরা মাত্র তিনজন সাথে নামায পড়তাম। মিয়া গোলাপ, আব্দুর সাত্তার এবং মিয়া জান মুহাম্মদ সাহেব।

হযরত সাহেব যেভাবে নামায পড়াতেন, সেই পদ্ধতি আমার জানা আছে। অর্থাৎ প্রতিটি নামায সময়মতো পড়তেন, বিনয়, নম্রতা ও কাকুতিমিনতির সাথে আদায় করতেন, যেভাবে কোনো শিশু তার বাবা-মায়ের সামনে কেঁদে কেঁদে কিছু চায়। এমন নামাযের আমাদের মুক্তাদীদের হৃদয়ে খুব প্রভাব পড়ত।

এটিই প্রথম শিক্ষা যা আমরা পেয়েছি। যখন হযরত সাহেব নামায শেষ করে বসতেন, তখন আমরা তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতাম- যা নূরানী বা জ্যোতির্ময় হতো এবং আমাদের হৃদয়কে খুব বিমোহিত করত।"

(আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৭)

পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত আকদাস (আ.) যে জানাযার নামায পড়াতেন- সুবহানাল্লাহ্! অত্যন্ত চমৎকার এবং একান্ত সুন্ন ত অনুযায়ী তা পড়াতেন। শত শত বার তাঁকে উপস্থিত ও গায়েবানা জানাযার নামায পড়াতে দেখা এবং তাঁর পেছনে পড়ার সৌভাগ্য এই অধমের হয়েছে। একবারের ঘটনা; কাদিয়ান নিবাসী মিয়া জান মুহাম্মদ মরহুম ইন্তেকাল করেন। হযরত আকদাস (আ.) জানাযার সাথে সাথে যান। এই মরহুম তাঁর ভক্ত, প্রেমিক ও নিবেদিতপ্রাণ সেবকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আকদাসও মরহুম মিয়া জান মুহাম্মদকে খুব ভালোবাসতেন। হযরত আকদাস (আ.) যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, যখন এই মরহুম আসতেন, তখন তিনি সব কাজ ফেলে মরহুমের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। বস্তুত যখন মরহুমের জানাযা কবরস্থানে গেল, তখন হযরত আকদাস (আ.) জানাযার নামায পড়ান এবং তিনি স্বয়ং ইমামতি করেন। নামায এত দীর্ঘ ছিল যে, আমাদের মুক্তাদীদের দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যথা করতে থাকে এবং হাত বাঁধা অবস্থায় ব্যথা শুরু হয়। অন্যদের কী অবস্থা হয়েছে আমি জানি না; কিন্তু আমি আমার কথা বলছি যে, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। এমন পরিস্থিতি আমার জীবনে কখনো আসে নি। এর কারণ হলো, আমরা তো দুই মিনিটে জানাযার নামায শেষ হতে দেখেছি।

এরপর যখন আমার বুঝলাম ও শিখলাম যে, আসল নামায এটিই- [অর্থাৎ পরবর্তীতে যখন ইবাদতের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করলাম;] তখন এটি আমার স্থায়ী বৈশিষ্ট্যহয়ে যায় এবং এক প্রকার স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি অনুভব হতে থাকে। আর মন চাইত, এখন নামায আরো দীর্ঘ হোক। [অর্থাৎ পরবর্তীতে তিনি (আ.) তাঁর সাহাবীদেরও এমন অভ্যাসে অভ্যস্ত করালেন, নামাযের এমন স্বাদ সৃষ্টি করে দিলেন যে, তারাও আনন্দ পেতে লাগলেন; তারা স্বয়ং এর স্বীকৃতি দিয়েছেন।] তিনি (রা.) বলেন, যখন জানাযার নামায শেষ হলো, তখন হযরত আকদাস (আ.) বাড়ির দিকে রওয়ানা হন। এক ব্যক্তি বলেন, হুযূর! নামাযে এত বেশি সময় লেগেছে যে, আমরা তো ক্লান্ত হয়ে গেছি! হুযূরের কী অবস্থা হয়ে থাকবে? [অর্থাৎ, আপনিও নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে গেছেন!]

হযরত আকদাস (আ.) উত্তরেবলেন: ক্লান্ত হওয়ার সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? আমরা তো আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছিলাম, তাঁর কাছে এই মরহুমের জন্য মাগফিরাত যাচনা করছিলাম, তাঁর কাছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই মরহুমের জন্য ক্ষমা চাইছিলাম। যে ভিক্ষা চায়, সে কি কখনো ক্লান্ত হয়? যে চাইতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে যায়, সে বঞ্চিত থেকে যায়। আমরা ভিক্ষুক আর তিনি দাতা; তাহলে ক্লান্তি কিসের? যার কাছে সামান্য আশাও থাকে, সেখানে

(এরপর ১০ পাতায়....)

সফর বৃত্তান্ত (অস্ট্রেলিয়া, ২০১৩)

জলসা সালানা অস্ট্রেলিয়ায় সমাপ্তি ভাষণ (শেষাংশ...)

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেছেন: এরপর শুধু আরবেই নয়, আফ্রিকার দেশগুলোতেও একইভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষকে পথনির্দেশ দিচ্ছেন। বুরকিনা ফাসো থেকে আমাদের একজন মুবাল্লিগ লিখেছেন যে, একজন যুবক বাই'আত গ্রহণ করেছে। যখন তাকে তার বাই'আতের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে ব্যাখ্যা করে যে সে সবসময় চিন্তা করত-কেন সকল মুসলমান কেবল আহমদীদেরই বিরোধিতা করে। একদিন সে রেডিও আহমদিয়ায় খলিফাতুল মসীহের একটি খুতবা শুনে, যেখানে হুজুর (অর্থাৎ আমার কথা উল্লেখ করে) পশ্চিমা প্রচারণার জবাব দিয়েছিলেন, যা পবিত্র নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে করা হয়েছিল, এবং তিনি নবী করীম (সা.)-এর মহৎ চরিত্র তুলে ধরেছিলেন ও তাঁর আদর্শ অনুসরণের উপদেশ দিয়েছিলেন। এটি শুনে আমি ভাবলাম, এত জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ আমাদের কোনো আলেম আজ পর্যন্ত দেননি। ফলে আমি প্রতি সপ্তাহে রেডিওতে খুতবা শোনা শুরু করি এবং নিয়মিত শুনতে থাকি। এই খুতবাগুলো আমার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এবং আমি বাই'আত করেছি। আমার সকল প্রশ্নের উত্তর আমি এই খুতবাগুলো থেকেই পেয়েছি। এই সকল লোক আহমদীদের বিরোধিতা করে কেবল এই কারণে যে, জামা'আতে আহমদিয়া আল্লাহ তাআলার একটি সত্যিকারের জামা'আত। আর সত্যবাদীদের সাথে সর্বদাই এমনটাই হয়ে থাকে।

এরপর জর্ডানের প্রখ্যাত পত্রিকা "আল-রায়ী"৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখের সংখ্যায় এমটিএ-এর অনুষ্ঠান "আল-হিওয়ার আল-মুবাশির"সম্পর্কে লিখেছে যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে প্রতিষ্ঠিত আহমদিয়া জামা'আত সম্পর্কে কারো মতামত যাই হোক এবং মির্জা গুলাম আহমদের দাবির ব্যাপারে যাই ধারণা থাকুক না কেন, এটি সুস্পষ্ট যে, এই জামা'আতের কিছু সদস্য ও খ্রিস্টান পাদ্রীদের মধ্যে তাওরাত ও ইনজিল নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তা প্রমাণ করেছে যে গির্জার ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ অত্যন্ত দুর্বল, যুক্তি ও জ্ঞানশূন্য এবং মধ্যযুগীয় চিন্তার ফল। সকলের নিকটই স্পষ্ট যে আহমদিয়া জামা'আতের ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনার দুটি দিক রয়েছে: একটি দিক হলো, যেখানে তারা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে তাদের বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে, এবং এ বিষয়ে আমরা তাদের সঙ্গে নানা উপায়ে আলোচনা করতে পারি। (এটিও তাদের ভ্রান্ত ধারণা; তবে তারা তাদের পাঠকদের জন্য এভাবে লিখেছে। বাস্তবে এখানে দাঁড়াতেও তারা সক্ষম নয়।)

অন্যদিকে তাদের ধর্মতত্ত্বের দ্বিতীয় দিকটিতে তারা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের আলোকে ইহুদি ও খ্রিস্টান মতবাদ নিয়ে আলোচনা করে, এবং বাস্তবতা হলো যে, খ্রিস্টান পাদ্রীদের তুলনায় আহমদিয়া জামা'আতের বিতর্ককারীরা সুস্পষ্টভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। জ্ঞানের ব্যাপ্তি হোক বা যুক্তি ও তর্কের শক্তি-প্রতিটি দিক থেকেই তাদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য রয়েছে। যে কেউ আহমদিয়া চ্যানেল দেখে, সে অনুভব করে যে বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় আহমদী বিতার্কিকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক সহনশীলতা ও উচ্চ নৈতিক চরিত্রের প্রকাশ ঘটে, এবং তাদের মধ্যে যুক্তি ও প্রমাণের শক্তি বিদ্যমান। সম্ভবত এই চ্যানেলটি এদিক থেকে অনন্য যে, এতে বক্তব্য প্রদানকারীদের কাছে পাদ্রী জাকারিয়া বুতরুসের উত্থাপিত আপত্তিগুলোর অসংখ্য জবাব রয়েছে-বিশেষত কুরআনুল কারীমের ভাষা সম্পর্কিত তার আপত্তিগুলোর। (আমরা কুরআনুল কারীম বা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রত্যেক আপত্তির জবাব দিই। আমরা কারো বিরুদ্ধে কথা বলি না; কিন্তু যেখানে ইসলামের ওপর আক্রমণ করা হয়, সেখানে অবশ্যই জবাব দিই। জবাব দেওয়া প্রয়োজন হয়, তবে প্রকৃত দাওয়াত হলো ইসলামের সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা।)

এতে আরও বলা হয়েছে যে "আল-হিওয়ার আল-মুবাশির"অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মীয় মতপার্থক্য ও আলোচনার এই অভিজ্ঞতা আমাদের উপলব্ধি করায় যে, ভিন্ন ধর্মমতের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক ভিত্তি অনুধাবনের জন্য এই ধরনের আলোচনার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। বিষয়কে বোঝা এবং অপর পক্ষের সঙ্গে সমঝোতার মনোভাব গ্রহণ করাই অন্যান্য জাতি ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে। যেমন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন: "হে মানবমণ্ডলী! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক সম্মানিত, যে অধিক পরহেজগার।"

বর্তমানে বহু আরব চ্যানেল রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞতা ও সংকীর্ণতার নিদর্শন। এই চ্যানেলগুলো নৈতিক অবক্ষয় ছড়ায় এবং বিভিন্ন অশ্লীল ও নীতিবিরোধী অনুষ্ঠান প্রচার করে। (এত কিছুর পরও তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হয়, আর আমরা যারা কুরআনুল কারীমের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা বিশ্বে তুলে ধরছি, আমাদের অমুসলিম বলা হয়।) তারা বলে, এর বিপরীতে এবং বিরল ব্যতিক্রম হিসেবে "আল-হিওয়ার আল-মুবাশির"অনুষ্ঠান রয়েছে, যা উপকারী আলোচনা উপস্থাপন করে এবং আহমদিয়া চ্যানেলে প্রচারিত হয়। আমরা চাই এ ধরনের অনুষ্ঠান অধিক পরিমাণে হোক, যাতে এগুলো একটি আলোকোজ্জ্বল তরঙ্গে পরিণত হয়, যা অন্ধকার দূর করতে সক্ষম-যেমনটি জ্ঞানীরা অবগত।

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন: এটি তাদের মন্তব্য। তারা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর দাবি অস্বীকার করুক না কেন, তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে ইসলামের প্রকৃত প্রচার ও জিহাদ আহমদিয়া জামা'আতই করছে এবং ইসলামের সুন্দর শিক্ষা তারাই উপস্থাপন করছে এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতিরক্ষায় তারাই দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো তাদের মতামত, যারা নিজেরাও মুসলমান বলে পরিচিত; তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা অনেককে আহমদিয়ত ও প্রকৃত ইসলাম গ্রহণের তৌফিকও দিয়েছেন। তবে আমি বিভিন্ন সময়ে আমার বক্তব্য, ভাষণ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তুলে ধরেছি যে, অমুসলিমরাও প্রকাশ্যে এ কথা স্বীকার করে, এবং এসব মতামত "রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স-এও প্রকাশিত হয়েছে, বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে, আজ অমুসলিমরা বলছে-তারা এখন প্রকৃত ইসলামকে চিনেছে; অন্যথায় তারা ইসলামে জিহাদের ধারণাকে সন্ত্রাস ও রক্তপাত হিসেবেই মনে করত। এখানেও কিছু সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তোমরা যে ইসলাম উপস্থাপন করছ, তা ভিন্নরকম মনে হয়। আমি তাদের উত্তরে বলি-এটাই সেই প্রকৃত ইসলাম, যা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।

দুই দিন আগে এখানে একটি বড় চ্যানেল, এবিসি-এর প্রতিনিধিরাও এসেছিলেন এবং একই কথা বললেন, সঙ্গে এটাও বললেন যে, একটি সমস্যা হলো-এই বার্তা এখনো অস্ট্রেলিয়ার মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। অতএব এটি আমাদের জন্য লজ্জার বিষয় যে, মানুষ জিজ্ঞাসা করছে কেন এই সুন্দর বার্তাটি তাদের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে না। আমি তাকে বলেছি যে, এখন আপনি আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, তাই এটিকে প্রচার করুন; আপনার মাধ্যমে অন্তত একটি শ্রেণির কাছে পৌঁছাবে। তবে যাই হোক, এই বার্তা পৌঁছানো আমাদের দায়িত্ব। প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর সঙ্গে আল্লাহ তাআলার অনেক প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যার মধ্যে খিলাফতের ব্যবস্থার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার হওয়ার প্রতিশ্রুতিও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রতিটি আহমদীরও কর্তব্য-যেখানেই থাকুক, এই বার্তা পৌঁছানো; কারণ এই প্রতিশ্রুতিগুলো শর্তসাপেক্ষ। কিছুটা পূর্ণ হবে বটে, কিন্তু যারা এতে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করবে না, তারা নিজেদেরই বঞ্চিত করবে। পরে পূর্ণ হলেও যারা কাজ করবে না, তারা বঞ্চিতই থাকবে।

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন: আপনারা হাজার হাজার পরিচিতিমূলক লিফলেট বিতরণ করেছেন। একজন বিশ হাজার বিতরণ করেছেন এবং পুরস্কারও পেয়েছেন। কিন্তু আমি বলেছিলাম, এক বছরের মধ্যে বড় দেশগুলোতে অন্তত পাঁচ শতাংশ এবং ছোট দেশগুলোতে দশ শতাংশ মানুষের কাছে ইসলামের বা শান্তির বার্তা পৌঁছাতে হবে। কিছু জামা'আত লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছে এবং বিশ্ব তাদের চিনতে শুরু করেছে। কিছু জামা'আত সংখ্যায় শত হলেও তারা লক্ষাধিক মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছিয়েছে। আপনারা যদি এখনো হাজারে সীমাবদ্ধ থাকেন, বা এক-দুই লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছান, তাও কোনো বড় অর্জন নয়। এটিকে বৃদ্ধি করতে হবে। সকল সহায়ক সংগঠন এবং জামা'আতের ব্যবস্থাকে এতে গতি আনতে হবে, যাতে প্রতি বছর দশ শতাংশ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে। এই লক্ষ্য স্থির করলেও, এই দেশে ইসলামের বা আহমদিয়তের প্রকৃত বার্তা পৌঁছাতে দশ বছর সময় লাগবে। বিশ্ব এখন চায়-এই ভালোবাসা ও মমতার বার্তা তাদের কাছে পৌঁছাক, ইসলামের প্রকৃত চিত্র তাদের সামনে উপস্থাপিত হোক।

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন: স্মরণ রাখবেন, যদিও দাওয়াতের অন্যান্য মাধ্যমও কাজ করছে এবং আল্লাহ তাআলা নিজেও সৎপ্রকৃতির মানুষদের পথনির্দেশ দিচ্ছেন-যেমন আমি কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছি-তবুও প্রতিটি আহমদীর কর্তব্য হলো খিলাফত থেকে প্রদত্ত প্রতিটি তহরীকের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা। এটি জরুরি নয় যে জামা'আতের ব্যবস্থাই আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে; ব্যক্তিরাও নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে ব্যবস্থার কাছে অনুরোধ করবে যেন তাদেরকে এই দাওয়াতি অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য উপকরণ প্রদান করা হয়।

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) বলেন: এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই প্রতিশ্রুতিগুলো নামাজ এবং আর্থিক ত্যাগের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, আমাদের কাজ তখনই বরকতময় হবে, যখন আমরা আমাদের নামাজসমূহের হেফাজত করব। আমরা যেন নামাজকে বোঝা বা কর মনে করে আদায় না করি; বরং এতে আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করি এবং একে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করি, পার্থিব কাজের ওপর নয়। আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সেই সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে, যেখানে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) আমাদের দেখতে চেয়েছেন। কিছু নবাগত যখন লেখে যে আহমদিয়ত গ্রহণের পর তাদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠেছে এবং কীভাবে

তারা নামাজে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি অনুভব করতে শুরু করেছে-তখন তা বিস্ময়কর মনে হয়।

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন: একজন লেবাননী নবাগত আহমদী লিখেছেন যে, পূর্বে আমি নামাজ পড়লে সর্বোচ্চ তিন মিনিট সময় লাগত; কিন্তু এখন হযরত মসলেহ মওউদ (রাযি.)-এর "তাফসীর সূরা ফাতিহা"পড়ার পর এক ঘণ্টা সময় লাগে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করতেই। এখন আমি নামাজের প্রকৃত তাৎপর্য এবং কুরআনের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পেরেছি।

একটি আরব দেশের এক বন্ধু লিখেছেন যে, প্রায় দুই বছর আগে আমি টেলিভিশনে বিভিন্ন চ্যানেল ঘোরাচ্ছিলাম, তখন এমটিএ আরাবিয়া দেখতে পাই। প্রথমে তেমন মনোযোগ দিইনি; কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে "আল-হিওয়ার আল-মুবাশির"এবং "লিকাআ মা' আল-আরব"অনুষ্ঠানগুলোতে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদীর আগমনের কথা শুনি এবং এমন গভীর কুরআনের তাফসীর শুনি যা সরাসরি আমার হৃদয়ে প্রভাব ফেলে। ধীরে ধীরে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা এবং হাদীসের বিশ্লেষণ শুনে আমার অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং আমি অনুভব করি যেন আমার নতুন জন্ম হয়েছে (এবং এই নতুন জন্ম প্রত্যেক আহমদীর মধ্যেই হওয়া উচিত, কারণ প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল এটি)।

তিনি আরও বলেন যে, আমি দোয়া ও নামাজের প্রকৃত উপলব্ধি লাভ করেছি, এবং আমার হৃদয় সাক্ষ্য দিয়েছে যে কাদিয়ানের হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আ.)-ই প্রকৃতপক্ষে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী। তাঁর আগমনের প্রমাণ সুস্পষ্ট, এবং তাঁর আগমনের বিষয়ে আমি পূর্বেই বহু হাদীস পড়েছিলাম। এরপর আমি আমার বন্ধু ও পরিচিতদের মধ্যে এই প্রেরিত ব্যক্তির দাওয়াত কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রচার করা শুরু করি; আর তারা পাল্টা কাহিনি, গল্প ও কুসংস্কার উপস্থাপন করত। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সত্য চিনে নেওয়া ও গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন।

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন: হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) বলেন: অতএব, এটি সেই বিপ্লব যা পৃথিবীতে আসছে, এবং এটি তাদের মধ্যেই আসছে যারা নিজেদের বায়'আতের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারছে, যারা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর সাথে সংযুক্ত হয়ে খিলাফতের গুরুত্বও উপলব্ধি করছে, এবং তখন আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরের প্রশান্তির ব্যবস্থাও সৃষ্টি করে দিচ্ছেন। হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য ধন-সম্পদের প্রয়োজন নেই; বরং প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। অতএব, প্রত্যেক আহমদীর উচিত আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করা, আর আল্লাহর অনুগ্রহ অর্জিত হয় তাঁর পূর্ণ আনুগত্য ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে।

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) বলেন: সুতরাং, যদি তোমরা জামাআতের সঙ্গে বায়'আতের অঙ্গীকার করে থাকো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করতে চাও, তবে তোমাদের ইবাদতের মানও উন্নত করতে হবে। দুনিয়াবী বিষয়গুলোকে গৌণ গুরুত্ব দিতে হবে এবং ইবাদতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তারপর আছে সমষ্টিগত ইবাদত, যার একটি উদাহরণ হলো জুমার নামাজ। এ দিকেও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এমনটি যেন না হয় যে রমযানের শেষ জুমা পড়েই দায়িত্ব শেষ মনে করা হলো। বরং প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত নিয়মিতভাবে প্রতিটি জুমার নামাজ আদায়ের চেষ্টা করা। এরপর রয়েছে জুমার খুতবা। আমি কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছি, যেখানে একজন ব্যক্তি বলেছেন যে তার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবং তার নৈতিক প্রশিক্ষণ অব্যাহত থেকেছে। এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে যে খুতবার বার্তা পৃথিবীর প্রতিটি কোণে পৌঁছায়, সেটিও শোনা উচিত। কোথাও দিন, কোথাও রাত-কিন্তু খিলাফতের কণ্ঠস্বর জুমার খুতবার মাধ্যমে একই সঙ্গে সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে। আমি এই মহাদেশে যে খুতবা দিয়েছিলাম, তা সারা বিশ্ব দেখেছে ও শুনেছে। এই সৌন্দর্য আজ আল্লাহ তাআলা খিলাফতের ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে জামাআতে আহমদিয়াকে দান করেছেন।

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) বলেন: খুতবায় বিশ্বের পরিস্থিতি অনুযায়ী দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়, এবং এই দিকনির্দেশনাও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর অনুগ্রহে প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে খুতবা প্রদান করা হয়। বিশ্বব্যাপী সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়, সেগুলোর জন্য দোয়ার আহ্বান জানানো হয়-এসবই সমষ্টিগত ইবাদত। এমন দৃশ্য আজ জামাআতে আহমদিয়া ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না।

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) বলেন: এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে ইবাদতের পাশাপাশি যাকাত ও আর্থিক ত্যাগের প্রতিও মনোযোগ দাও, তাহলে তোমরা উন্নতি লাভ করবে। জামাআতের আর্থিক উদ্যোগগুলো বিশ্বব্যাপী দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সেবার জন্য বহু প্রকল্প পরিচালনা করছে, এবং ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ হয়েছে, তাবলিগের ব্যয়ও এই আর্থিক অনুদানের মাধ্যমেই পূরণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে জিহাদের ময়দানের জন্য মুবাল্লিগদের প্রস্তুত করা হয়। আজ ভারত, পাকিস্তান, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ঘানা ও ইন্দোনেশিয়ায় জামিয়া (মিশনারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান) রয়েছে, যেখানে সাত বছরের কোর্সের মাধ্যমে মুবাল্লিগদের প্রস্তুত করা হয়। এরপর বিভিন্ন দেশে মু'আল্লিমদের (শিক্ষক) প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের সবার শিক্ষাক্রম একই। এটিও একটি ঐক্য এবং জামাআতে আহমদিয়ার সৌন্দর্য যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মানুষ জ্ঞান অর্জন করছে, ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং একই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে এক ঐক্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই ঐক্যও খিলাফতের ব্যবস্থার ফল। এরপর রয়েছে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ, যা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় সম্পন্ন হয়েছে এবং হচ্ছে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও কুরআনের সত্য বার্তা প্রত্যেক মানুষের কাছে তাদের নিজ নিজ ভাষায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এরপর রয়েছে বিভিন্ন সাহিত্য, এবং এম.টি.এ.-এর কথা আগেই উল্লেখ হয়েছে। এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে নৈতিক প্রশিক্ষণ ও তাবলিগের কাজ হচ্ছে। আমি কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছি; এখন আরও কিছু উপস্থাপন করছি।

কুয়েতের একজন ব্যক্তি, মনসুর সাহেব লিখেছেন যে তিনি তিন মাস আগে থেকে এম.টি.এ. দেখা শুরু করেছেন, যা তাকে অন্ধকার ও কুসংস্কার থেকে বের করে আলোতে এনেছে। নামাজ, যা আগে একটি শারীরিক ব্যায়ামের মতো মনে হতো, এখন তাতে তিনি আধ্যাত্মিক আনন্দ অনুভব করেন। এখন তার মনে হয় যেন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে কুরাইশদের মধ্যে অবস্থান করছেন, কারণ যাদের সঙ্গেই তিনি কথা বলেন, তারা তার বিরোধিতা করে এবং তাকে কাফের বলে। আর যে বিষয়টি তাকে আহমদিয়তের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত করেছে, তা হলো মোল্লাদের পক্ষ থেকে জামাআতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার। যখন তিনি অনুসন্ধান করেন, তখন দেখেন যে আপনারাই সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এরপর মরক্কো থেকে একজন লিখেছেন যে তার মা নিরক্ষর এবং আহমদিয়ত সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তবে একদিন তিনি এম.টি.এ. দেখছিলেন, তখন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর ছবি দেখে হঠাৎ বলে উঠলেন যে এই চেহারা নবীদের মতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম কীভাবে তিনি এ ধারণায় পৌঁছালেন। তিনি বললেন, এটি তার হৃদয়ের অনুভূতি। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ প্রকাশ করে চলেছেন।

এরপর মিশর থেকে এক বন্ধু লিখেছেন যে পাঁচ-ছয় বছর আগে তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেন। তিনি তাকে শক্তভাবে আলিঙ্গান করেন এবং একটি খোলা জায়গায় নিয়ে যান। তখন তিনি কিছু কারণে রাগান্বিত ছিলেন। তিনি তাকে সামনে একটি ভবনের দিকে তাকাতে বলেন, এবং তখন সেখান থেকে একটি বিকৃত, শয়তানের মতো চেহারার মানুষ বের হয়। তিনি বলেন, যখন মানুষ রাগান্বিত হয়, তখন এই শয়তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তিনি তাকে রাগ না করার উপদেশ দেন এবং এটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। তারপর তিনি তাকে আলিঙ্গান করে চলে যান। তিনি আনন্দের সাথে বলেন যে আমার প্রিয় নবী আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু ঘুম থেকে জেগে তিনি বুঝতে পারেন যে সেই চেহারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ছিল না; তিনি অন্য কাউকে দেখেছেন, কিন্তু তখন তা বুঝতে পারেননি। কিছুদিন পরে, টিভি চ্যানেল পরিবর্তন করতে গিয়ে তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর ছবি দেখেন এবং বুঝতে পারেন যে তিনিই সেই ব্যক্তি যাকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন। তবুও তখন তিনি বায়'আত করেননি। এটি চার বছর আগের ঘটনা। সম্প্রতি তিনি ঘুম থেকে জেগে একটি আওয়াজ শুনতে পান: তুমি সবকিছুর ওপর বিশ্বাস কর, কিন্তু কাদিয়ানের মির্জা গোলাম আহমদের ওপর বিশ্বাস কর না, যাকে আল্লাহ আসমান থেকে প্রেরিত করেছেন? এরপর তিনি উঠে তার সন্তানদের বলেন যে আজ থেকে তোমরা আহমদী, এবং তিনি তাদের ও তার স্ত্রীকে উপদেশ দেন যে যদি মৃত্যু আসে, তবে আহমদী অবস্থায় আসুক।

এরপর জর্ডান থেকে এক মুবাল্লিগ লিখেছেন যে কুয়েতের এক নারী, যিনি জর্ডানে এম.ফিল করছিলেন, এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে জামাআতের সাথে পরিচিত হন। বায়'আতের পর তাকে 'হাকীকাতুল ওহী' বইটি দেওয়া হয়, যা তিনি কুয়েতে ফেরার পথে বিমানে পড়া শুরু করেন। পরে তিনি বার্তা পাঠান যে তিনি বইটি পড়তে পড়তে কাঁদছিলেন। যে কেউ চাইলে সূর্যের কোমল ও উজ্জ্বল কিরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, আর যে কেউ চাইলে তা থেকে উপকৃত হতে পারে। তোমাদের ধন্যবাদ, তোমরা আমাকে সূর্য দেখিয়েছ।

এরপর আলজেরিয়া থেকে উসামা সাহেব বলেন যে সম্প্রতি তিনি এম.টি.এ. দেখে বায়'আতের তৌফিক পেয়েছেন, যেখানে "আল-হিওয়ার আল-মুবাশির"প্রোগ্রামে ঈসা (আ.)-এর ওফাত সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এটি তাকে গভীরভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে। এরপর তিনি "লিকাআ মা' আল আরব"প্রোগ্রামে কুরআনের স্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত তাফসির শোনেন এবং প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর ছবি দেখেন। এতে তার একটি পুরনো স্বপ্নের কথা মনে পড়ে, যেখানে তিনি একটি সোনার খাটে শুয়ে আছেন এবং একজন দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ তার চারপাশে ঘুরছেন। এম.টি.এ.-তে সেই ছবি দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে তিনিই সেই ব্যক্তি এবং জামাআতের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হন।

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) বলেন: যেমন আমি উল্লেখ করেছি, এই আয়াতগুলোতে বারবার আনুগত্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অতএব, সর্বদা মনে রাখবে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পর খিলাফতের আনুগত্যও অপরিহার্য। এখানে বলা হয়েছে 'মা'রূফ' সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে হবে-অর্থাৎ যেগুলো শরিয়তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমি যে উদাহরণগুলো দিয়েছি, তা থেকে বোঝা যায় কীভাবে মানুষ ঈমান, আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও

খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা প্রশ্ন তোলে না বা তর্ক করে না; বরং খিলাফত থেকে যা বলা হয়, তা যথার্থ সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করে, কারণ এ ধরনের সিদ্ধান্ত সর্বদা শরিয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে কোনো খলিফা শরিয়তের পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত দেবেন না, কারণ তার কাজই হলো নবীর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিশ্রুত মসীহের পর খিলাফতের ধারাবাহিকতার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যার অর্থ হলো প্রতিশ্রুত মসীহের কাজ খিলাফতের মাধ্যমেই চলতে থাকবে। অতএব, যারা বায়'আতে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব খিলাফতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা এবং তা অনুসরণ করা।

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) বলেন: প্রত্যেক আহমদী-শিশু, যুবক, প্রাপ্তবয়স্ক, পুরুষ ও নারী-সুস্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে ইসলামের অগ্রগতি এখন খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্কিত, কোনো মোল্লা, গোষ্ঠী বা সরকারের সঙ্গে নয়। এই কারণেই আজ আল্লাহ তাআলা জামাআতে আহমদিয়াকে বিশ্বের পথপ্রদর্শক বানিয়েছেন, যারা প্রকৃত ইসলাম উপস্থাপন করছে, ঐশী প্রতিশ্রুতির শর্ত পূরণ করছে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ইবাদতে উন্নতি করছে, আধ্যাত্মিক ও আর্থিক ত্যাগে অগ্রসর হচ্ছে এবং উচ্চমানের আনুগত্য প্রদর্শন করছে। আল্লাহ তাআলা এমন মানুষ সৃষ্টি করতে থাকবেন যারা তাঁর প্রতিশ্রুতির শর্ত পূরণ করবে, এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই পূর্ণ হবে। তবে প্রত্যেক আহমদীর চিন্তা করা উচিত যে তারা ও তাদের সন্তানরা যেন এই শর্ত পূরণ না করার কারণে বঞ্চিত না হয়ে যায়।

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) বলেন: অতএব, এটি গভীর চিন্তার বিষয়। আল্লাহর অনুগ্রহে জামাআতে আহমদিয়ার এই কাফেলা এগিয়ে যেতে থাকবে, এবং পৃথিবীর কোনো শক্তিই এর অগ্রগতি থামাতে পারবে না। সুতরাং, যেমন আমি বলেছি, দোয়া, ত্যাগ এবং পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেদের এর অংশ বানাও এবং এর বরকত থেকে উপকৃত হও। প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর মিশন পূরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করো-যা হলো পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শাসন প্রতিষ্ঠা করা, তাঁর সুন্দর আদর্শ প্রমাণ করা, পবিত্র কুরআনের আলোকোজ্জ্বল শিক্ষা বিশ্বে পৌঁছে দেওয়া, মুসলমানদের এক বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ করা এবং অমুসলিমদের আল্লাহর সামনে নত হতে আহ্বান করা।

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) বলেন: অতএব, উঠে দাঁড়াও এবং এই দায়িত্ব শুধু কথায় নয়, বরং প্রতিটি কাজে পালন করো। জীবন, সম্পদ, সময় ও সম্মান ত্যাগের বাস্তব প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের অন্তর্ভুক্ত হও, যারা কিয়ামত পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপ হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এ তৌফিক দান করুন।

(খুতবার শেষাংশ....)

ভিক্ষাপ্রার্থী নাছোড়বান্দা হয়ে চাইতে থাকে। সব আশাভরসা তো খোদার কাছে; তিনি 'মু'তি' (দাতা), তিনি 'ওয়াহ্হাব' (পরম দাতা), তিনি 'রহমান' (পরম দয়ালু), তিনি 'রাহীম' (পরম করুণাময়) এবং তিনি মালিক। "

(তাযকিরাতুল মাহদী, প্রণেতা- হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানি, পৃ: ৭৫)

এছাড়া তিনি আযীয (পরাক্রমশালী)। তাহলে ক্লান্ত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরও এই চিন্তাধারার সাথে নামায আদায় করার তৌফিক দান করুন। আমরা তো হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতও এই অঙ্গীকারের সাথে করেছি যে, আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ মোতাবেক নামায আদায় করব। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ করে তাঁর প্রশংসাগীত গেয়ে নামায পড়ব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই অঙ্গীকারও পালন করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি দুটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথমটি হলো মু কাররমা আমাতুশ শরীফ সাহেবার, যিনি নারোয়ালের ডেরিয়ানওয়ালাস্থ মাহমুদ আহমদ বাট সাহেবের স্ত্রী। তিনি সম্প্রতি চুরাশি বছর বয়সে ইন্তে কাল করেছেন, ***'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।*** আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মূসীয়া ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীগুজরাত জেলার শাদিওয়াল নিবাসী হযরত মৌলভী উমর দীন সাহেব (রা.)-র কন্যা ছিলেন, যিনি নিজের একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে ১৯০৩ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঝিলম সফরের সময় তাঁর পবিত্র হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্বামী ছাড়াও ছয় ছেলে ও পাঁচ মেয়ে এবং নাতি-নাতনি রয়েছেন।

তার এক ছেলে আসিফ মাহমুদ বাট সাহেব দারুস সালাম, তানজানিয়ায় মুরব্বী সিলসিলাহ হিসেবে কর্মরত এবং কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে তিনি নিজের মায়ের জানাযা ও দাফনে শামিল হতে পারেন নি। তার এক নাতি ওসামা বাটও এখানে মুরব্বী, একইভাবে তার এক জামাতাও মুরব্বী। এটি ওয়াকেফে যিন্দেগী বা জীবন উৎসর্গকারী পরিবার।

তার ছেলে মুরব্বী সিলসিলাহ আসিফ মাহমুদ বাট সাহেব- যিনি তানজানিয়ায় আছেন- তিনি লেখেন, তিনি অসংখ্য গুণের অধিকারী ছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক; তিনি সত্যস্ব প্ন দেখতেন যা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পূর্ণ হতো। পবিত্র কুরআনের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল, যা তিনি তার বুযুর্গ পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। প্রতিদিন ফজরের পর পাড়ার আহমদী ও অআহমদী ছেলে-মেয়েদের তিনি পবিত্র কুরআন পড়াতেন। তার পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা এবং শোনাও পছন্দ ছিল। তিনি আরো বলেন, আমার কাছেও তিনি শুনতেন এবং যদি কোথাও আমি থেমে যেতাম; আমি যাচাই করতে চাইতাম যে, বার্ধক্য সত্ত্বেও তার মনে আছে কি না, তাই আমি থেমে যেতাম; তখন তিনি অবিলম্বে পরের শব্দগুলো পড়ে দিতেন। পবিত্র কুরআন তার বলতে গেলে প্রায় মুখস্থই ছিল। তিনি বলতেন, বৃদ্ধ বয়সে আমি সব কিছু ভুলে গেছি, কিন্তু আল্লাহ্র ফযলে পবিত্র কুরআন মনে আছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলির প্রতি তার অসাধারণ আসক্তি ছিল; সর্বদা কোনো না কোনো বই পড়তেন। একইভাবে 'দুররে সামীন', 'কালামে মাহমুদ', হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র নযমের বই- এগুলোর সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং অধিকাংশ নযম তার ভালোভাবে মুখস্থ ছিল।

তার জামাতা মুরব্বী সিলসিলাহ মাসউদ সাহেব বলেন, আমি যখন কাদিয়ান যাই তখন তিনি আমাকে বলেন, 'সেখানে বেশি বেশি পায়ে হেঁটে চলবে, কারণ সেখানকার গলিগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পায়ে হেঁটে চলতেন।' আল্লাহ্ তা'লার তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন এবং তার সন্তানদের পক্ষে করা তার দোয়াসমূহ কবুল করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো লাহোরের মুকাররম শেখ বশীর আহমদ সাহেব। তিনিও সম্প্রতি সাতানব্বই বছর বয়সে ইন্তে কাল করেছেন, ***'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।*** আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন ছেলে ও পাঁচ মেয়ে রয়েছেন। তিনি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার 'মুখতারে আম' মরহুম শেখ মুহাম্মদ দীন সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্রছিলেন। তিনি পূর্ব আফ্রি কা, যুক্তরাজ্য ও আমেরিকার আমীর ও মিশনারি ইনচার্জ মরহুম শেখ মোবারক আহমদ সাহেব এবং আরব দেশগুলোর মুবাল্লিগ শেখ নূর আহমদ মুনীর সাহেবের ছোটো ভাই ছিলেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী, নামায-রোযায় অভ্যস্ত, মিশুক ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি আহমদীয়া জামা'ত লাহোরের নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। চৌধুরী আসাদুল্লাহ্ খান সাহেব ও চৌধুরী হামীদ নসরুল্লাহ্ সাহেবের জেলা আমেলার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বিশ বছরেরও অধিক সময় তিনি নিজের হালকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অত্যন্ত চমৎকারভাবে তিনি জামা'তের কাজ সম্পন্ন করতেন এবং মসজিদ নির্মাণ ও অন্যান্য অনেক জামা'তী সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জামা'তের আর্থি ক তাহরীকসমূহে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করতেন এবং নিজের সন্তানদেরও এর উপদেশ দিতেন। খিলাফতের সাথে তার অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল এবং সর্বদা এই সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং সন্তান ও নিকটাত্মীয়দেরও সর্বদা এর শিক্ষা দিতেন।

আমিও দেখেছি, তিনি অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ ছিলেন এবং পরম বিনয়ের সাথে সবার সাথে মেলামেশা করতেন।তার মেয়ে আসিফা সাঈদুল্লাহ্ বলেন, ফজরের পর তিনি অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করতেন, যা আমাদের সব ভাই-বোনের তরবিয়তের কারণ হয়েছে।

একইভাবে তার আরেক মেয়ে যিনি এখানেই থাকেন, তিনি বলেন, আমার যখন রাবওয়ায় বিয়ে হয় তখন তিনি আমাকে বলেন, 'তুমি বড়োই ভাগ্যবতী যে, তুমি রাবওয়া তথাকেন্দ্রে যাচ্ছ। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে সন্তানদেরও সঠিক তরবিয়ত করার তৌফিক দিন।' তার চিন্তাধারা কেমন দেখুন! ব্যবসায়ী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াদারির কথা বলেন নি, বরং সন্তানদের ধর্ম শিখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন এবং তার সন্তানদের পক্ষে করা তার দোয়াসমূহ কবুল করুন। (আমীন)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family
Bithari, 24 PGS (N)

সীরাত খাতামান্নবীঈন

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ

নারীর অবস্থান

সামগ্রিকভাবে আরবে নারীদের অবস্থা অনুকূল ছিল না। সত্য যে, সাধারণভাবে একজন নারী তার স্বামী নির্বাচন করার অধিকার ভোগ করত; কিন্তু এই নির্বাচন সম্পন্ন করার পর বাস্তবে সে ব্যাপকভাবে স্বায়ত্তশাসন থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ত। তবুও বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ নারীরা প্রায়ই তাদের স্বামীদের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হতো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারীরা যুদ্ধে পুরুষদের সঙ্গে যেত; তাদের ভূমিকা ছিল পুরুষদের মধ্যে সম্মানবোধ জাগিয়ে তোলা এবং আহতদের সেবাশুশ্রূষা করা। নারীরা কবিতাও রচনা করত; উদাহরণস্বরূপ, আল-খানসা জাহিলিয়াত যুগের এক প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেন।

নারীদের মধ্যে পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল না; বরং তারা অবাধে চলাফেরা করত। বহুবিবাহের কোনো নির্দিষ্ট সীমা ছিল না, এবং একজন ব্যক্তি ইচ্ছামতো যত স্ত্রী রাখতে পারত। কিছু ক্ষেত্রে পুত্র তার পিতার বিধবাকে উত্তরাধিকারসূত্রেগ্রহণ করে নিজের অধিকারে নিয়ে নিত, এবং একই সময়ে দুই সহোদরা বোনকে বিবাহ করাও প্রচলিত ছিল। তবে এ ধরনের প্রথাগুলো আরব অভিজাত সমাজে সমাদৃত ছিল না। আরবে তালাকের প্রচলন ছিল ব্যাপক, এবং স্বামী যখন ইচ্ছা স্ত্রীকে পৃথক করতে পারত। কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথাও আরবে ছিল, যদিও তা কিছু নির্দিষ্ট গোত্রে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সর্বজনীন ছিল না।

কন্যারা উত্তরাধিকার পেত না, স্ত্রীও পেত না; বরং যদি কোনো ব্যক্তির পুত্রসন্তান না থাকত, তবে তার মৃত্যুর পর তার সমগ্র সম্পত্তি তার ভাইয়ের নিকট চলে যেত, ফলে তার স্ত্রী ও কন্যারা সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হয়ে পড়ত।

রীতিনীতি ও প্রথাপ্রিয়তা

পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করা হবে যে, ইসলামের আবির্ভাবের সময় আরবে বিভিন্ন ধর্ম বিদ্যমান ছিল, যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব মতবাদ ও বিশ্বাস ছিল। কিন্তু রীতি-নীতি ও জাতীয় চরিত্রের দিক থেকে সমস্ত আরব যেন এক জাতি ছিল, এবং উপরোক্ত অভ্যাস ও নৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ, জাহিলিয়াত যুগে ইয়াসরিবে ফিত্যুন নামে এক ইহুদি প্রধান ছিল। তার একটি কুখ্যাত প্রথা ছিল যে, শহরে যে কোনো কন্যার বিবাহ হলে তাকে প্রথমে তার গৃহে পাঠানো হতো। ফলে মদিনার বহু ইহুদি তাদের নিরপরাধ কন্যাদের বিবাহের পূর্বে তার নিকট পাঠাত, এবং পরবর্তীতে তারা স্বামীর জন্য বৈধ গণ্য হতো। অবশেষে এক সম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ফিত্যুনকে হত্যা করে। অনুরূপভাবে, সেই সময় খ্রিষ্টানদের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, যা স্যার উইলিয়াম মিউর তার রচনায় স্বীকার করেছেন। সংক্ষেপে, মূর্তিপূজক, ইহুদি বা খ্রিষ্টান-সকলেই নৈতিক অবস্থা ও সামাজিক আচরণে প্রায় একই রূপ ধারণ করেছিল; হত্যা, লুণ্ঠন, জুয়া, ব্যভিচার এবং মদ্যপান সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

রীতিনীতির প্রতি আনুগত্যও সর্বজনীন ছিল, এবং প্রথাপ্রিয়তা এত গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে তার সামনে ধর্মের গুরুত্বও তুচ্ছ হয়ে পড়ত। অসংখ্য অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, 'আযলাম দ্বারা বণ্টন' নামে একটি প্রথা ছিল: দশজন ব্যক্তি একটি কোরবানিতে অংশগ্রহণ করত, কিন্তু তা অনুপাত অনুযায়ী বণ্টন না করে তীরের মাধ্যমে লটারির মতো ভাগ্য নির্ধারণ করা হতো, এবং যে যার ভাগে যা পেত তা গ্রহণ করত, আবার কেউ কেউ কিছুই পেত না। প্রতিটি তীরের নির্দিষ্ট নাম ও নির্ধারিত অংশ ছিল।

তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণও প্রচলিত ছিল; মানুষ যে কোনো কাজের পূর্বে তীরের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। এ উদ্দেশ্যে কাবায়ও তীর রাখা থাকত, এবং মানুষ সেখানে গিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করত। অনুরূপভাবে, পাখির উড্ডয়ন থেকেও শুভাশুভ নির্ধারণের প্রথা ছিল।

কিছু গোত্রে আরেকটি অদ্ভুত প্রথা ছিল যে, কেউ যদি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করত এবং কোনো কারণে ফিরে আসত, তবে সে দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে পেছনের দিক দিয়ে প্রবেশ করত। এ প্রথার প্রতি পবিত্র কুরআনেও ইঙ্গিত রয়েছে।

কিছু গোত্রে যখন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করত, তখন তার উটকে তার কবরের পাশে বেঁধে রাখা হতো, যতক্ষণ না তা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মারা যেত। নারীদের মধ্যে অতিরিক্ত শোকপ্রকাশের প্রবণতা ছিল, এবং কখনো কখনো বছরের পর বছর ধরে মাতম চলত।

সাধারণভাবে আরব নারীরা পশুর দুধ দোহন করত না, কারণ এটিকে তাদের জন্য লজ্জাজনক মনে করা হতো। কোনো পরিবারের কোনো নারী যদি এ কাজ করতে দেখা যেত, তবে তা সেই পরিবারের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস করত।

আরেকটি প্রথা ছিল মূর্তির নামে বা কোনো মানতের ফলে পশু উৎসর্গ করে তাকে মুক্ত করে দেওয়া। এ প্রসঙ্গে চার প্রকারের পশু বিশেষভাবে পরিচিত ছিল:

সায়েবা: এমন একটি উটনী, যা ধারাবাহিকভাবে দশটি স্ত্রী সন্তান জন্ম দিয়েছে। এ ধরনের উটনীর উপর আরোহন করা হতো না, তার দুধ কেবল অতিথিদের জন্য নির্ধারিত থাকত, এবং তার লোম কাটা হতো না।

বাহীরা: সায়েবা উটনীর একাদশ স্ত্রী সন্তান; এর কান ছিদ্র করে তাকে তার মায়ের সঙ্গে মুক্ত করে দেওয়া হতো।

হাম: এমন উট, যা ধারাবাহিকভাবে দশটি সন্তানের পিতা হয়েছে; তাকে প্রজননের জন্য অবাধে ছেড়ে দেওয়া হতো।

ওসীলা: এমন ছাগল, যা পাঁচবার প্রসবে ধারাবাহিকভাবে দশটি স্ত্রী সন্তান জন্ম দিয়েছে। এর পরবর্তী সন্তানের মাংস কেবল পুরুষদের জন্য নির্ধারিত থাকত এবং নারীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল; তবে যদি এদের মধ্যে কোনো সন্তান মারা যেত, তবে তার মাংস নারীরাও ভক্ষণ করতে পারত।

এই পশুগুলোর উল্লেখ পবিত্র কুরআনেও রয়েছে।

বিবাহ সম্পর্কেও বিভিন্ন অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণভাবে চার প্রকার বিবাহ ছিল, যার মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত ও নিকৃষ্ট রূপটি ছিল এমন যে, একাধিক পুরুষ পর্যায়ক্রমে এক নারীর সঙ্গে সহবাস করত। পরে নারী সন্তান প্রসব করলে তারা পুনরায় একত্রিত হতো, এবং নারী যাকে সন্তানের পিতা হিসেবে নির্ধারণ করত, সন্তান তার সঙ্গেই সম্পৃক্ত গণ্য হতো। তবে সম্মানিত শ্রেণির মানুষ এ ধরনের অনৈতিকতা থেকে মুক্ত ছিল।

উপরোক্ত উদাহরণগুলো কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে; বাস্তবে আরবে এ ধরনের প্রথার সংখ্যা ছিল অসংখ্য, এবং নানা অদ্ভুত রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। ইসলাম এই সকল অপসংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে।

আরবের প্রাচীন ধর্মসমূহ

ইসলামের পূর্বে আরবে বিভিন্ন ধর্ম প্রচলিত ছিল, যাদের মধ্যে প্রধান ছিল মূর্তিপূজা, দাহরিয়্যাহ (নাস্তিক্যবাদ), জরথুস্ত্রবাদ, সাবীয়ান ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম এবং ইহুদিধর্ম। এর মধ্যে মূর্তিপূজা ছিল সর্বাধিক বিস্তৃত এবং একে দেশের প্রধান ধর্ম বলা যেতে পারে। মূর্তিপূজকেরা আল্লাহ্?র অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু তারা মূর্তিকে তাঁর নিকট পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করত। কিন্তু এই মধ্যস্থতার মধ্যে তারা এতটাই জড়িয়ে পড়েছিল যে প্রকৃত উপাস্যের ধারণা তাদের মন থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সাধারণ মূর্তির পাশাপাশি প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব মূর্তি ছিল। উদাহরণস্বরূপ, মক্কায় ইসাফ ও নায়েলা কুরাইশদের মূর্তি ছিল, যাদের সামনে কোরবানি করা হতো। নাখলায় অবস্থিত উজ্জা ছিল কুরাইশ ও বনু কিনানার যৌথ মূর্তি। তায়েফে লাত ছিল বনু সাকীফের মূর্তি; মানাত ছিল আওস ও খাজরাজের মূর্তি; দুমাতুল জান্দালে ওদ্দ ছিল বনু কালবের মূর্তি; সু?আ ছিল হুযাইল গোত্রের মূর্তি; ইয়াগুস ছিল মাধহিজ ও তায়্য গোত্রের মূর্তি; নসর ছিল যুল-কালার মূর্তি; এবং ইয়াউক ইয়েমেনে হামদান গোত্রের মূর্তি। এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ মূর্তি ছিল হুবাল, যা কাবায় স্থাপিত ছিল এবং যুদ্ধে বিজয়ের সময় এর নাম উচ্চারণ করা হতো।

আরবের মূর্তিপূজকদের ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল কাবা, যেখানে তারা বহু মূর্তি একত্র করেছিল। প্রতি বছর আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুশরিকরা হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় সমবেত হতো। এটি মূলত ইবরাহিমীয় শিক্ষার একটি অবশেষ ছিল, যদিও তারা হজের আচার-অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিরকপূর্ণ উপাদান সংযোজন করেছিল, যা ইসলাম পরবর্তীতে অপসারণ করে। মক্কার এই ধর্মীয় মর্যাদার কারণে এটিকে এবং এর আশেপাশের অঞ্চলকে হারাম হিসেবে গণ্য করা হতো, যেখানে রক্তপাত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। একইভাবে, হজ ও উমরাহর সুবিধার্থে বছরে চারটি মাস-মুহাররম, রজব, জিলকদ ও জিলহজ্জ-পবিত্র মাস হিসেবে বিবেচিত হতো, যেগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকত এবং মানুষ নিরাপদে চলাচল করতে পারত।

মূর্তিপূজার পাশাপাশি আরবে দাহরিয়্যাহ মতবাদও প্রচলিত ছিল; এর অনুসারীরা আল্লাহ্?র অস্তিত্ব, পুনরুত্থান এবং শাস্তি ও পুরস্কারের ধারণাকে অস্বীকার করত। এই মতবাদের উল্লেখ পবিত্র কুরআনেও রয়েছে।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

যখন তোমাদের কাছে কোনও ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান ব্যক্তি বিবাহ প্রস্তাব পাঠায়, তখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিও; অন্যথায় পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা তৈরী হবে। (তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rasheed (Late), Basantapur, 24 PGS (s)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Berhampur, Murshidabad

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 26 Mar-2 Apr 2026 Issue No.13-14

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সীরাতুল মাহদী

–হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

{২৩} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এই অধম নিবেদন করছে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) জীবনের শেষ দিকে লেখালেখির কাজ বাঁকা নিব দিয়ে করতেন এবং দাগহীন সাদা কাগজ ব্যবহার করতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, কাগজ নিয়ে তার দুই পাশে ভাঁজ করে নিতেন, যাতে উভয় দিকে সাদা মার্জিন থাকে। তিনি কালো কালি দিয়েও লিখতেন, আবার নীল ও কালো (কালিও ব্যবহার করতেন। মাটির একটি ছোট ঢেলার মতো বস্তু তৈরি করিয়ে তার মধ্যে নিজের দোয়াত বসিয়ে রাখতেন, যাতে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

সাধারণত তিনি লিখতে লিখতে হেঁটে বেড়াতেন; অর্থাৎ হাঁটতেনও, আবার লিখতেনও। দোয়াতটি এক জায়গায় রেখে দিতেন, এবং যখন তার পাশ দিয়ে যেতেন তখন নিবে কালি লাগিয়ে নিতেন। লিখতে লিখতে তিনি নিজের লেখা পড়তেও থাকতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি নিজে নিজে পড়তেন, তখন তাঁর ঠোঁট থেকে গুনগুন করার মতো শব্দ বের হতো, ফলে শ্রোতা স্পষ্টভাবে শব্দগুলো বুঝতে পারত না।

এই অধম মির্জা সুলতান আহমদ সাহেবকে পড়তে শুনেছে; তাঁর পদ্ধতি হযরত সাহেবের পদ্ধতির সঙ্গে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তাঁর লেখা ছিল দৃঢ়, কিন্তু কিছুটা ভাঙাচোরা ধরনের; যার অভ্যাস নেই, সে সহজে পড়তে পারত না। তিনি লেখা কাটাকাটি করে পরিবর্তনও করতেন; ফলে তাঁর লেখায় বহু স্থানে কাটা অংশ দেখা যেত। তাঁর হস্তাক্ষর ছিল খুব সূক্ষ্ম ও সরু। নিম্নে তার একটি নমুনা দেওয়া হলো।

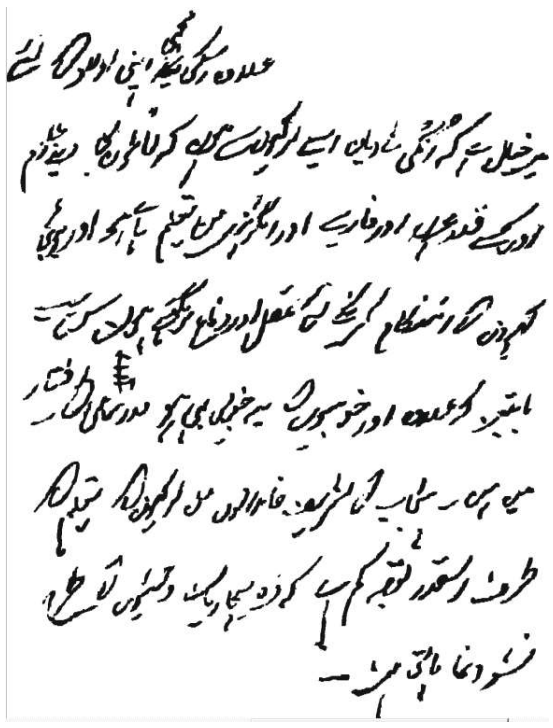

চিঠির নমুনা

এর অতিরিক্ত আমার নিজের সন্তানদের জন্য এই চিন্তা রয়েছে যে, তাদের বিবাহ এমন মেয়েদের সঙ্গে হোক, যারা দীনী শিক্ষা অর্জন করেছে এবং কিছুটা আরবি, ফারসি ও ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেছে, এবং বড় পরিবারের গৃহব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা রাখে। সুতরাং অন্যান্য গুণাবলীর পাশাপাশি এই গুণগুলোও থাকা প্রয়োজন। এসব বিষয় আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পাঞ্জাবের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোতে কন্যাশিক্ষার প্রতি এত কম মনোযোগ দেওয়া হয় যে, তারা বেচারীরা প্রায় অসভ্যদের মতোই বেড়ে ওঠে।

এই অধম নিবেদন করছে যে, উক্ত অংশটি একটি চিঠি থেকে গৃহীত, যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মির্জা মাহমুদ বেগ সাহেব পট্টিকে লিখেছিলেন।

{২৪} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আমার নিকট আমার সম্মানিতা মাতাজান বর্ণনা করেছেন যে, যখন তোমার তায়া (মির্জা গুলাম কাদির সাহেব, অর্থাৎ হযরত সাহেবের বড় ভাই) নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তেকাল করেন, তখন তোমার তায়ি হযরত সাহেবের কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলেন যে, তাঁর ভাইয়ের সম্পত্তি সুলতান আহমদের নামে দত্তকপুত্র হিসেবে লিখিয়ে দিন; তা যেভাবেই হোক এখন তো আপনারই, এবং এভাবে হলেও আপনারই থাকবে।

অতএব হযরত সাহেব তোমার তায়ার সমস্ত সম্পত্তি মির্জা সুলতান আহমদের নামে লিখিয়ে দেন। এই অধম মাতাজানের নিকট জিজ্ঞাসা করেছিল যে, হযরত সাহেব কীভাবে দত্তক নেওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করলেন? মাতাজান বলেন, এটি আসলে কেবল কথার কথা ছিল; মৃত্যুর পর আবার দত্তক কিসের! উদ্দেশ্য ছিল কেবল তোমার তায়ির সন্তুষ্টির জন্য হযরত সাহেব তোমার তায়ার সম্পত্তি মির্জা সুলতান আহমদের নামে নথিভুক্ত করিয়ে দেন এবং নিজের নামে করেননি।

কারণ সে সময়কার পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে হযরত সাহেব মনে করতেন যে, যাই হোক না কেন, মির্জা সুলতান আহমদ আপনার সম্পত্তি থেকে অর্ধেক অংশ পাবেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক মির্জা ফজল আহমদের প্রাপ্য হবে। সুতরাং তিনি মনে করলেন যে, যেন তিনি নিজের জীবদ্দশাতেই মির্জা সুলতান আহমদের অংশ আলাদা করে দিয়েছেন। (বাকি পরবর্তীতে)

(সীরাতুল মাহদী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮–২০, প্রকাশিত: কাদিয়ান)

১১ পাতার শেষাংশ....

আরবে জরথুস্ত্রবাদীরাও ছিল; তারা অগ্নি ও নক্ষত্র পূজা করত, তবে তারা আল্লাহ্?র অস্তিত্বেও বিশ্বাসী ছিল এবং তাদের ধর্মে উপাসনার বিধানও ছিল। গবেষকদের মতে, এই ধর্মটি মূলত ইরানি উৎসের এবং আদিতে একটি অবতীর্ণ ধর্ম ছিল, যা ক্রমান্বয়ে বিকৃত হয়ে যায়। বর্তমান পারসি সম্প্রদায় এই ধর্মের অনুসারী।

সাবীয়ান ধর্মও আরবে প্রচলিত ছিল, যার উল্লেখ কুরআনে রয়েছে। এটি জরথুস্ত্রবাদ ও ইহুদিধর্মের সংমিশ্রণ ছিল। তবে মনে হয়, আরবরা সাধারণভাবে যে কোনো ব্যক্তিকে, যে তার প্রাচীন ধর্ম ত্যাগ করে একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম গ্রহণ করত, 'সাবী' বলে অভিহিত করত; এ কারণেই কখনো কখনো মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদেরও এ নামে ডাকা হতো।

খ্রিষ্টধর্ম ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই আরবে প্রবেশ করেছিল এবং কিছু গোত্র তা গ্রহণ করেছিল। নাজরান অঞ্চল এই ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

আরবের ইহুদিরা মূলত সিরিয়া অঞ্চল থেকে আগত ছিল, এবং পরে কিছু আরব গোত্রও ইহুদিধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল ইয়াসরিব, খায়বার ও তাইমা।

আরেকটি ধর্মীয় প্রবণতা ছিল, যা হযরত ইবরাহিম (আ.)–এর সাথে সম্পৃক্ত এবং একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী; একে কেউ কেউ 'হানিফ ধর্ম' নামে অভিহিত করত। মহানবী (সা.)–এর প্রারম্ভিক যুগে এবং তার কিছু পূর্বে, আরবের চরম মূর্তিপূজায় বিমুখ হয়ে এবং নবুয়তের উদীয়মান সূর্যের প্রথম আলোকরশ্মি উপলব্ধি করে, কিছু ব্যক্তি এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তবে সমগ্র আরবে তাদের সংখ্যা ছিল অতি অল্প, এবং তাদের অধিকাংশই মক্কা ও তার আশেপাশে বসবাস করত। এদের মধ্যে যায়েদ ইবনে আমর উল্লেখযোগ্য, যিনি হযরত উমরের চাচাতো ভাই ছিলেন এবং মহানবী (সা.)–এর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল; তবে তিনি নবুয়ত লাভের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। প্রসিদ্ধ সাহাবী এবং আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত সাঈদ ইবনে যায়েদ ছিলেন তার পুত্র। যায়েদের মূর্তিপূজার প্রতি এতটাই বিরাগ ছিল যে তিনি মূর্তির নামে উৎসর্গকৃত খাদ্য গ্রহণ করতেন না এবং মানুষকে তাদের উপাস্যের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। তায়েফে উমাইয়া ইবনে আবি সালত, একজন প্রসিদ্ধ কবি ও সম্মানিত নেতা, মূর্তিপূজা ত্যাগ করে হানিফ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধের পর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেননি। একবার মহানবী (সা.) তার একেশ্বরবাদী কবিতা গভীর আগ্রহে শ্রবণ করেন এবং দুঃখের সঙ্গে বলেন, "উমাইয়া প্রায় মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না।" (চলবে)

(সীরাত খাতামুন্ নবিয়্যীন, পৃ. ৫৫–৫৯, কাদিয়ান, ২০০৬)

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয়আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal, From Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir